মুখোশের চোখে জল

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

উমেশচন্দ্র পাবলিক লাইব্রেরী
খুলনা।
যোগ সংখ্যা :
ডাক নম্বর :
মূল্য তারিখ

স্থাপিত-১৮৯৭
খুলনা

ASB

আমি এক ভবঘুরে, বাউণ্ডুলে মানুষ। আমার চালচুলোর কোনো ঠিক নেই। দাদা-বউদির সংসারের এক পাশে পড়ে থাকি। সামান্য যা উপার্জন করি, প্রায় পুরোটাই বউদির হাতে তুলে দি। আমি একজন ফেরিঅলা। সেলসম্যান বললে গৌরব কিছুটা বাড়তে পারে ; কিন্তু বলি কোন আক্কেলে ! দোকানে দোকানে জর্দা নিয়ে ঘুরি। কিলাপাত্তি, বেনারসী, গুণ্ডি। জর্দার আবার নম্বর আছে। নেশা কতরকম !

আমার বাহারি কোনো পোর্টফোলিও ব্যাগ নেই। চটের একটা ঢাউস ব্যাগ। ভেতরে গুচ্ছের বড়, ছোট কৌটো। ওজনও নেহাত কম নয়। এমন অভ্যাস হয়ে গেছে, ডান হাতে ওই ওজনটুকু না থাকলে আমি হাঁটতে পারি না। ব্যালেন্স হারিয়ে ফেলি। ব্যাগটাই আমার অর্ধাঙ্গিনী। একবার এক ঝাঁকামুটে, দেখি মাথায় করে একটা বাছুর নিয়ে চলেছে। আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করেছিলুম, এ কেয়া রে ! সে পরিষ্কার ইংরেজিতে বলেছিল, লোড্। লোড ছাড়া তার মনে হয়, শূন্যে ভেসে উঠছে। মাটিতে তার পা থাকছে না। যেমন আমি, ডান দিকে ব্যাগের ভারে হেলে না থাকলে, মনে হয় উল্টে পড়ে যাবো। হেলে গরু আমি। হাল টেনে জমি চাষ করি না। তাহলে তো অবস্থা ফিরতো। হেলে চলি। হিল্লি-দিল্লি ঘুরে বেড়াই। অবশ্য সংসারও এইরকম এক অদৃশ্য ভার। দাদাকে দেখে আমার তাই মনে হয়। এক সময় চাঁচর চিকুর ছিল। শখের থিয়েটার করত। আমাকে বলত, ফ্যামিলিতে একটা প্রতিভার উদয় হয়েছে মাত্তু। শিশির ভাদুড়ীর জায়গাটা খালি পড়ে আছে। আর তিনটে বছর। বঙ্গ রঙ্গমঞ্চের দ্বিতীয় শিশির তোর সামনে। পায়ের ধুলো নে। তখন তোকে আমি ফ্রি পাস দোবো। রোজ বিনা পয়সায় থিয়েটার দেখবি।

দাদার মতো আমারও সেই সময় একটা ধারণা হয়েছিল, আমাদের বংশ প্রতিভাধরের বংশ। মাসের শেষে বাবার হাত যখন খালি হয়ে আসত, তখন

কবিতা লিখতেন। বড় বড় কবিতা। আর একটা মহাকাব্য লেখার ইচ্ছে ছিল। জীবনে কুললো না। কি করে কুলোবে! খালি পেটে ঢুকু ঢুকু চা খেয়ে খেয়ে লিভার শুকিয়ে গেল। শেষের দিকে চেহারাটা হয়ে গিয়েছিল চামচিকির মতো। সেই শরীর নিয়েই অফিস যেতেন। শেষে একদিন আমাদের ফেলে উড়ে গেলেন মহালোকে।

আর আমার মা যখন পঞ্চমে চিৎকার করতেন, মনে হত বেগম আখতার বাঙলায় গলা ছেড়েছেন। বাবার মৃত্যুর পর মা সাংঘাতিক ভক্ত হয়ে পড়লেন কবিতার। বাবার কবিতার খাতায় রোজ ফুল দিতেন। একদিন সেই খাতার একটা পাতা ছিঁড়ে পাশের বাড়ির হাসিকে প্রেমপত্র লিখেছিলুম বলে দরজার খিল খুলে বেধড়ক পিটিয়েছিলেন। বলেছিলেন, আমার এই খাতায় ভবিষ্যতে যদি কেউ হাত দেয়, আমি তার লাশ ফেলে দেবো।

এখন মনে হয়, সংসারের দারিদ্র্যকে মা যদি শান্ত মাথায় একটু মেনে নিতে পারতেন, তাহলে বাবা হয়তো আরো কিছু দিন বাঁচতেন। আমি খুব রেমার্কের ভক্ত। তিনি এক জায়গায় লিখছেন, মানুষ যখন বেঁচে থাকে তখন তার জন্যে কেউ মাথা ঘামায় না। মরে যাবার পর হাজার হাজার টাকা খরচ করে মনুমেন্ট তৈরি করে। ওই টাকার সিকির সিকি তার দেখা-শোনার জন্যে খরচ করলে মানুষটা হয়তো আরো দশ, কুড়ি বছর বাঁচত। মনুমেন্টের প্রয়োজন হত না। মানুষ এক মজার জীব। they only prize what they no longer possess. মায়ের কাণ্ডকারখানা দেখে এই কথাটা আমি ডায়েরিতে লিখে রেখেছিলুম। এই কথা কেন, ডায়েরিতে তখন আমি অনেক কথাই লিখতুম। তখন আমি ছাত্র। পৃথিবীটা তখন ভয়ঙ্কর রকমের রোমান্টিক। পৃথিবীর মালেরা কেমন, মালিকরা কেমন, আত্মীয়রা কেমন, প্রতিবেশীরা কেমন, মেয়েরা কেমন, মহাপুরুষেরা কেমন, কিছুই তখনো জানা হয়নি। পৃথিবী সবুজ। পাখি গায়, নদী বয়, প্রেম ঝরে, ভালাবাসা গোলাপ হয়, সাহায্যের হাত এগিয়ে আসে, দুঃখীর চোখের জল বড়লোক পকেট থেকে সিল্কের রুমাল বের করে মুছিয়ে দেয়। রাতের বেলা ছাতে পরী নামে। সমুদ্র থেকে উঠে আসে মৎস্যকন্যা। সুন্দরীদের দিকে করুণ চোখে তাকালেই প্রেমে পড়ে যায়। জীবন তখন ঘিরে রেখেছেন রবীন্দ্রনাথ, জীবনানন্দ, শেক্সপিয়ারা, এলিয়ট, রাসেল, আইনস্টাইন। আসল মালেদের তখনো চেনা হয়নি। ডায়েরিতে কোটেসান লিখি। মুখস্থ করি। অনুসরণ করি। খাওয়াদাওয়ার কষ্ট, অভাব-অভিযোগ গ্রাহ্য করি না। শোনা ছিল, কষ্টে মানুষ হলে মানুষ মহাপুরুষ হয়। যেমন

দাড়ি। যতই চড়চড় করে কামাবে, ততই ঘন হবে, চাপ হবে। ভালো করে লেখাপড়া শিখবো, ভাল রেজাল্ট করব। ভাল চাকরি পাবো। শেষ জীবনে মোটা টাকার ওপর বসে হা হা করে হাসবো, বগল বাজাবো। সিনেমায় যেমন বাড়ি দেখা যায়, সেইরকম বাড়ির সবুজ লনে বিস্কুট কোম্পানির বিজ্ঞাপনের বুড়োর মতো বসে থাকবো, চা কোম্পানির রমণীর মতো আমার স্ত্রী হাতে চায়ের কাপ এগিয়ে দেবেন, টেক্সটাইল কোম্পানির বিজ্ঞাপনের যুবকের মতো আমার ছেলে এগিয়ে আসবে, ব্লেড কোম্পানির বিজ্ঞাপনের যুবতীর মতো আমার পুত্রবধূ তার গায়ে লটকে থাকবে। তখন আমি এই ধরনের এক বোকা পাঁঠা ছিলুম। রোম্যান্টিক ফুল। সমবয়সীরাও অনুরূপ ছাগল ছিল। মাংসর দোকানের সামনে বেঁধে রাখা ছাগলের মতো। আধ বোজা চোখে বটপাতা চিবোচ্ছে। আধ ঘণ্টা পরেই ধড় একদিকে, মুণ্ড একদিকে। এক ঘণ্টার মধ্যেই মশলা মাখা অবস্থায় কড়াইতে কষা চলছে। দু ঘণ্টার মধ্যেই তোফা টেকুর। দেশলাই কাঠি আন। খুঁচিয়ে বের করি। ছাগলটাকে নয়। দাঁতের ফাঁক থেকে ছাগলের একটা কেঁসো। আবার হেঁকে জিজ্ঞেস করবে, 'হ্যাঁ গা ভাল করে পেঁপে দিয়েছিলে তো। তা না হলে ডাইজেস্ট হবে না। কনস্টিপেসান হয়ে যাবে।'

দাদা যেমন ভাবত বিশ্বাল অভিনেতা হবে; আমিও সেইরকম ভাবতুম, ইবসেনের বাঙালি সংস্করণ হব। সাংঘাতিক সাংঘাতিক নাটক লিখবো, আর আমার সুদর্শন দাদা হবে নায়ক। একটা লিখেও ফেললুম। দাদা শুনেটুনে বললে, এটা তোর রেডিও নাটক হয়ে গেছে। চরিত্ররা নড়ছেও না, চড়ছেও না। যে যার জায়গায় বসে আড়াই হাত লম্বা এক একটা ডায়ালগ ছাড়ছে। এটা নাটক হয়নি, গোল করে জড়ানো গজ-ব্যাণ্ডেজ হয়েছে। নাটক তোর হাতে হবে না, বরং পত্র-সাহিত্য লেখ। এ ওকে চিঠি দিচ্ছে ও একে চিঠি দিচ্ছে। আমার সেই প্রথম সৃষ্টি। বিকলাঙ্গ হলেও তো সন্তান! নামটাও খুব জবরদস্ত, সারিসারি মুখ। দাদা নাটকের কি বোঝে! যুগ পাল্টাচ্ছে। একদিন না একদিন এর কদর হবেই। জীবনের কোনো কিছুই ফেলা যায় না।

আমার দাদার 'ফেট'ও বাবার দিকেই চলেছে। ওই একই অবস্থা হবে। সামান্য একটা সরকারি চাকরি করে। এরই মধ্যে দুটো ছেলে-মেয়ে। নাটক এখন মঞ্চ ছেড়ে ঘরে এসে গেছে। টাকার জোর না থাকলে মানুষের যে কি অশান্তি! তেল ছাড়া মাছ ভাজা হয়। সংসার তো ফিশ-ফ্রাই। ছেলে-মেয়েরা হল পোটাটো চিপস্। সেই ভাজা ততই মুচমুচে হবে যতই তুমি

তেল ঢালবে। তা না হলেই আধ-পোড়া। দরকচা। দাদার সংসারের সেই অবস্থা। মাসে একবার অফিসের গেট খুলে মিছিল বেরোয়। নানা রকমের নারী-পুরুষ, ঝাণ্ডা, ফেস্টুন নিয়ে বেরিয়ে আসে। থপথপ করে হেলেদুলে হাঁটে। কেউ ডাইনে কাত, কেউ বাঁয়ে কাত। কারোর হাঁটুতে বাত, কোমরে খেঁচকা, স্পন্ডিলোসিস। এই পাল যাঁরা পরিচালনা করেন, একমাত্র তাঁরাই বেশ হৃষ্টপুষ্ট। সরব। কিন্ডারগার্টেন স্কুলের ছেলে-মেয়েদের নিয়ে যেন চিড়িয়াখানা দর্শনে চলেছেন। ইস্যু, নিজেদের জীবন-সমস্যা, অভাব-অভিযোগ নয়, আমেরিকা, জার্মানি, আফ্রিকা, কম্বোডিয়া, কাম্পুচিয়া, সাম্য, মৈত্রী, বিশ্বভ্রাতৃত্ব। মিছিলের ভেতর দিয়ে রাস্তা পার হতে চেয়েছিলেন অধৈর্য বৃদ্ধ, তাকে পিটিয়ে বের করে দিয়ে মৈত্রীর স্লোগান। একদিন দাদাকে ওই রকম এক মিছিলে আমি দেখেছিলুম। আমি রাস্তা পার হব বলে দাঁড়িয়ে আছি। দাদা আমার পাশ দিয়ে চলছে। মাথায় রোদ এড়াবার জন্যে সাদা রুমালটা বেঁধেছে। আমার দিকে করুণ চোখে তাকাতে তাকাতে চলে গেল। প্রখর রোদে বেচারা যেন আর চলতেই পারছে না। তখন মনে হয়েছিল, আমি কত ভাল আছি! কারোর দাসত্ব করতে হয় না। আমার চটি ক্ষয়ে গেছে। আমার গেঞ্জিতে গোটা তিনেক গোল গর্ত। ইচ্ছেমতো খরচ করার পয়সা নেই পকেটে। ডান দিকে হেলে গেছি; তবু আমি সুখী। দিনান্তে ময়দানে গাছের ছায়ায় বসে কলসির চা খাই। হাতে মাথা রেখে চিত হয়ে শুয়ে থাকি। ঝলমলে নীল আকাশ। শাখা-প্রশাখার নৃত্য। বেলা শেষের উদাস পাখি। ঘাসের গন্ধ। পিঁপড়ের সুড়সুড়ি। পেটটা জ্বালা জ্বালা করে। মনে হয় কিছু খাই। হিসেবী মনের অনুমতি মেলে না। লম্বা ফিতের মতো সামনে পড়ে আছে জীবনের অগণিত দিন। মনে পড়ে যায় সামান্য সঞ্চয়ের সতর্কতা। একদিন এই পা দুটো শরীরকে আর টানতে চাইবে না। বাবার সামান্য হাঁপানির মতো ছিল। মাঝে মধ্যে প্রচণ্ড পরিশ্রম হলে আমিও একটা শ্বাসকষ্ট ক্ষণিকের জন্যে অনুভব করি। যৌবনের অন্তলগ্নে এইটাই প্রবল হবে। সারা রাত দেয়ালে পিঠ রেখে সামনের দিকে পা দুটো ছড়িয়ে দিয়ে সামান্য একটু বাতাসের জন্যে আমাকে ফুসফুসের হাপর টানতে হবে। আমি জানি, আমার কি হবে; কিন্তু ভয় পাই না। যা হবে তা হবে। দাদার মতো জ্যোতিষীর কাছে দৌড়োই না। মন খারাপ করে ফিরে আসি না।

আমার বউদিটা ভীষণ ভাল মেয়ে। মিষ্টি আতরের মতো। পাতলা, ধারালো চেহারা। চোখ দুটো ভাসা ভাসা। সাংঘাতিক সেন্স অফ হিউমার।

মানিয়ে নেওয়ার ক্ষমতা অসীম। দাদাও ভীষণ ভাল ছেলে। আত্মভোলা মহাদেব। ভাইপোটা দেবদূতের মতো। ভাইঝিটা পরী। আমি জানি, এরা কোনোদিন পয়সার মুখ দেখবে না। বেশ দাপটে দাপিয়ে বাঁচতে হলে নিষ্ঠুর, কর্কশ, স্বার্থপর, নীচ, অসভ্য হতে হয়। এরা এইভাবেই হাঁটবে, তীর্থপথের পথিকের মতো, চটিতে চটিতে বিশ্রাম নিতে নিতে।

ভাইঝিটার নাম পিউ। কিশোরী। আমাকে ভীষণ ভালবাসে। বকে, ধমকায়, শাসন করে। মাঝে মাঝে কথা বন্ধ করে দেয়, আমি যদি অবাধ্য হই। কাল থেকে কথা বন্ধ চলেছে। অপরাধ খুবই সামান্য। ওর মা একটা ডিম সেদ্ধ খেতে দিয়েছিল। পিউ সেটাকে এনে বলেছিল, 'তোমার হাফ আমার হাফ।'

আমি বলেছিলুম, 'হাফ বয়েলের আবার হাফ কি'? ডিমটা তুলে ওর মুখে ঢুকিয়ে দিয়েছিলুম। খেতেও পারছে না, ফেলতেও পারছে না। স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে আমার দিকে। চোখের কানায় কানায় জল। কোনো রকমে ডিমটা গিলে, কান্না জড়ানো গলায় বলেছিল, 'যাও, তোমার সঙ্গে আর কোনো দিন কথা বলব না।' আমি হ্যা হ্যা করে হেসে তার অভিমানের মেঘটা উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করেছিলুম। কোনো কাজ হয়নি। আমার লোপ্রেসার। মাঝে মাঝে এত নেমে যায় মাথা তুলতে পারি না। তখন প্রায় হামাগুড়ি দেওয়ার অবস্থা। মন্দ লাগে না। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ঘুরছে। পিউ আমার এই অবস্থাটা জানে। টাল খেয়ে পড়ে যেতে যেতে দেয়াল ধরে ফেলছি। পিউ শুনেছে ডিম খেলে লোপ্রেসার কমে। মেয়েটার মনটা হয়েছে মায়ের মতো। কত দিন দেখেছি বউদি নিজের খাবার কাজের মেয়েটার সঙ্গে ভাগ করে খাচ্ছে। কি ব্যাপার! শাশুড়ি তিন দিন খেতে দেয়নি। এই রকম প্রায়ই হয়। আর বউদির খাওয়া মাথায় উঠে যায়। কিছু বললেই, মিষ্টি হেসে বলবে, দু'জনেই বাঁচি না।

পিউ চায়ের কাপটা আমার নড়বড়ে টেবিলে বেশ শব্দ করে রেখে বললে, 'একজনের চা রইল। যেন তাড়াতাড়ি খেয়ে নেওয়া হয়। ঠাণ্ডা হয়ে গেলে যেন পিউকে দোষ দেওয়া না হয়! গুণের তো শেষ নেই।'

আমার আয়নায় আমি পিউকে দেখতে পাচ্ছি। হলুদ ফুল ছাপ ফ্রক পরেছে। ঝুম ঝুম চুল ঝুলে আছে কপালে। মোমের মতো মুখ। ভিক্টোরিয়ার পরীটা যেন নেমে এসেছে। আমি আমার দাড়ি নিয়ে ভয়ঙ্কর ব্যস্ত। সহজ, সামান্য ব্যাপারটাকেই আমি আমার প্রতিভায় সকালের কঠিনতম কাজ করে

তুলেছি। শুনেছি মানুষের মাথার চুল ভুস ভুস করে উঠে যায়। আমার দাড়ি কামাবার বুরুশের চুল জলে ভিজিয়ে গালে লাগানো মাত্রই ভুস করে উঠে গালে জড়িয়ে যায় সাবানের ফেনার সঙ্গে। বহুবার ভেবেছি বুরুশটাকে এইবার ছুটি দোবো। পরে ভেবেছি, চুল উঠে যাচ্ছে বলে কি কোনো মানুষের চাকরি যায়। সাবধানে ব্যবহার করতে হবে। এই আর কি? বুরুশের চুলের ওপর বেশি ধকল যেন পড়ে না যায়। আমার ব্লেড ভোঁতা। রোজই ভাবি ব্লেড কিনব, রোজই ভুলে যাই। ভুলে বাড়ি চলে এসে ভাবি, যাক ভালই হয়েছে, খরচ বেঁচেছে। অন্তত একটা দিন, পয়সাটা পকেটে রইল। বয়সে মানুষের বুদ্ধির ধার-কমে গেলে কি তাকে বাতিল করে দেওয়া হয়! না হয় একবারের জায়গায় দশবার টানবো। আমি তো আর টাটা-বিড়লা নই, যে টাইম ইজ মানি, বলে কাছাকোঁচা খুলে সময়ের পেছনে ছুটবো! সময় আমার পেছনে পেছনে আসবে। একজন আমাকে বলেছিলেন, বড়লোক হবার উপায় হল, খরচ না করা।

ধুর মশাই, বড়লোক হওয়ার কথা আমি স্বপ্নেও ভাবি না। আমার কথা হল, আমার আয়ের মধ্যে কোনো রকমে বেঁচে থাকা।

তাহলে সব ফুটো বন্ধ করে দাও। যে-চৌবাচ্চায় জল ঢোকে না সেই চৌবাচ্চার ছেঁদা বন্ধ করে দিতে হয়। সংরক্ষণ নীতি। কিছু খরচ পাবলিকের ওপর পাস করে দাও। মাঝে মধ্যে একটা দুটো সিগারেট। নস্যি। দেশলাই। এ-সব জনগণ সাপ্লাই করবে। দু'চার কাপ চা, জনগণ। বাড়িতে গেলে পাবে না হয় তো। সেখানে জাঁদরেল হস্টেল সুপারিনটেন্ডেন্টের মতো বসে আছেন কর্তাদের গৃহিণী। তাঁরা সংসারে মেরে রেখেছেন কড়া মালকোঁচা। কত্তার কোনো হিসেব নেই, তাই আমাকেই চেপে ধরতে হয়েছে। কত্তার লাইসেনস আছে ড্রাইভিং জানেন না। আমার লাইসেন্স নেই ড্রাইভিং জানি। সব সংসারই এখন লো ভোল্টেজের একশো ওয়াট বাল্‌ব। সরু জলের কল। আজ বালতি ধরলে কাল ভর্তি হবে। তাই কত্তাদের অফিসে টুঁ মারবে। লাঞ্চটাইম আর বলব না, মুড়ি-টাইম। এক গাল, দু' গাল মুড়ি মিলবে। মিলবে এক কাপ অফিস-ব্র্যান্ড টি। পিত্ত-রক্ষা হবে। বাঙালি এখনো তেমন ছোটলোক হয়নি। সামনে বসে থাকলে না দিয়ে খেতে পারে না। টাকা চাইলে কুঁকড়ে যেতে পারে। মুখ হয়ে যেতে পারে ছাইয়ের মতো সাদা। জিনিস চাইলে তা হবে না। লোক লৌকিকতায় যেখানে চাঁদার উপহার সেখানে অবশ্যই যাবে। পেট ঠেসে খাবে, তিন দিন আর হাঁ করতে

হবে না। কমের ওপর দিয়ে চলে যাবে। যেখানে একক, একার পকেট থেকে খসবে, সেখানে অসুস্থ হয়ে পড়বে। পারিনি ভাই, লো প্রেসার, কি স্ট্রং ডায়েরিয়া। এই সব বলে কাটিয়ে দেবে। র‍্যাগ-পিকার্সের কায়দায় বাঁচতে হবে। দেখোনি, কাঁধে বস্তা, এটা ওটা কুড়িয়ে চলেছে। আগে তো একটা গ্রাম্য গালাগালই ছিল, ঘুঁটে কুড়ুনির বেটা।

কেনাকাটার সময় সজাগ থাকবে, ফ্রি-গিফ্‌ট কোন্ মালের সঙ্গে আছে। টুথব্রাশ, চামচে, গেলাস, প্লাস্টিকের কৌটো, চিরুনি, ডট পেন, যা পাওয়া যায়। একবারে অচল না হলে কোনো কিছু কিনবে না। খরচের নেশা মদের নেশার মতোই সাংঘাতিক। নিজের ইচ্ছেটাকে বাছুরের মতো বেঁধে রাখবে। ছাড়া পেলেই তোমার রোজগারের দুধ খেয়ে নেবে। খরচে মানুষের বাড়িতে গিয়ে চোখ-কান খোলা রাখবে। দেখবে অনেক প্রয়োজনীয় জিনিস পড়ে পড়ে নষ্ট হচ্ছে। সেগুলো জোগাড় করে নিয়ে আসবে। কৌশল করে বাঁচতে শেখো। যোগ হল কর্মের কৌশল। গীতা বলেছেন।

এই শিক্ষাতেই চলেছি আমি, তার প্রমাণ আমার এই বুরুশ। রোজই থোকা থোকা চুল উঠে যাচ্ছে। এ তো মাথা নয় যে ভাইটালাইজার লাগিয়ে টাক পড়া বন্ধ করব। পিউ তাকে উদ্দেশ করে বললে, 'দেখিস চা, তোর মধ্যে আবার সাবানসুদ্ধ বুরুশ না ডুবিয়ে দেয়! অনেক গুণই তো আছে।'

আমি বুরুশটা মগের মধ্যে ফেলে দিয়ে আচমকা পিউয়ের হাতটা চেপে ধরলুম, 'চালাকি পেয়েছ খুকু, তিন দিন আড়ি। দেশে কি আইনকানুন নেই।'

পিউ হাত ছাড়াবার জন্যে শরীরটাকে পেঁচাতে লাগল। শেষে আমার বুকে। রেশমের মতো এক মাথা ঝুমকো ঝুমকো চুল। নতুন শরীর। ভেতরের যন্ত্রপাতি একেবারে আনকোরা নতুন। তাই শরীরটা পাথরের গেলাসের মতো ঠাণ্ডা। পিউ দু' হাতে আমার কোমরটা জড়িয়ে ধরল, 'তুমি তো আমার কথা শোনো না। অবাধ্য।'

'এইবার থেকে শুনবো মা। তোমার জন্যে কি এনেছি দেখবে?'

খুব সামান্য, সামান্য জিনিসেই পিউ সন্তুষ্ট। আমি যখন বাইরে যাই, ভীষণ ইচ্ছে করে দামি কোনো উপহার কিনে নিয়ে যাই। ট্যাঁকের জোর তো নেই। যা কিছু রোজগার উপহারের পেছনে উড়িয়ে না দিয়ে বউদির হাতে যতটা পারা যায় দিতে পারলে, ছেলে মেয়ে দুটো একটু ভাল খেতে পাবে। আমি করি কি নদীর নুড়ি পাথর কি অদ্ভুত কোনো গাছের পাতা, কাঁচা বাঁশ, বেতের টুকরো, পাখির বাসা, অসাধারণ আবৃতির গাছের ডাল সংগ্রহ করে আনি। একটু

পরিশ্রম হয়, পিউ কিন্তু ভীষণ খুশি হয়। এমন ভাব করে যেন হীরে পেয়েছে। মেয়েটা মনে হয় প্রকৃতিপ্রেমী হবে, নেচার আর্টিস্ট। ও যখন আরো বড় হবে, আমি তখন নিশ্চয় বড় লোক হব। পিউকে আমেরিকা পাঠিয়ে দোবো। কত কি শিখে আসবে। অভাব অভাব করে আমার আর দাদার তো কিছু হল না। ছেলে আর মেয়ে দুটোকে আচ্ছা করে মানুষ করতে হবে। বিশাল একটা বাড়ি হবে। গাড়ি হবে। রাতের বেলা সব ঘরে আলো জ্বলবে। জানালায় জানালায় পর্দা ঝুলবে। আশায় বাঁচে চাষা।

আমার নড়বড়ে টেবিলের ড্রয়ার খুলে দু' পাতা টিপ বের করলুম। কাল কিনে এনেছি নিউ মার্কেট থেকে। বিদেশী টিপ। অপূর্ব দেখতে। পিউ টিপ ভীষণ ভালবাসে। পাতা দুটো দোলাতে দোলাতে বললুম, 'পিউ, এটা কার ?'

পিউ ছুটে এল, 'ওমা ! কি সুন্দর ! কাকা তুমি গ্রেট ! তোমার সঙ্গে আর কোনোদিন আমার ঝগড়া হবে না। এখন একটা পরবো কাকু ?'

'অফ কোর্স।'

পিউয়ের সঙ্গে মাঝে মাঝে আমার ইংরেজিতে কথা হয়। ইংরেজিটা ভাল করে না শিখলে ফিউচার ডুম। একালের ছেলেরা বলে ফুটুরডুম।

পিউ বললে, 'মিরার প্লিজ।'

আয়নাটা নিয়ে পিউ একটা টিপ কপালের মাঝখানে সেট করল। যেন প্রজাপতি উড়ছে। নিজেই তারিফ করলে, 'ফ্যান্টাস্টিক।'

আমার দিকে তাকিয়ে বললে, 'বলো কেমন দেখাচ্ছে ?'

ওয়ান্ডারফুল ওয়ান্ডারফুল।

'তাহলে আমি এখন একটু বেরোই। সকলকে দেখিয়ে আসি। মাকে গোটাচারেক দেবো, কি বলো ?'

'অঃ শিওর।'

পিউ লাফাতে লাফাতে চলে গেল। যদি কেউ প্রশ্ন করেন, 'বেঁচে থেকে কি পেলে ? সহায়, সম্বলহীন। টানাটানি, ছেঁড়াছিড়ি।' আমি সঙ্গে সঙ্গে বলব, 'এই তো, এই সব মুহূর্ত। এই তো আমার হীরে, চুনী, পান্না। সুখের জীবন বড্ড বোদা। দুঃখের জীবন সুস্বাদু তরকারির মতো। সারা দিন যাঁরা ঠাণ্ডা ঘরে বসে থাকেন, তাঁরা কোনো দিন বুঝতে পারবেন না, অসহ্য ঘামের শরীরে সামান্য একটু ফিকে বাতাস কি সুখের !' আমি তর্ক করতে চাই না। আমার জীবন আমারই জীবন। আপনার জীবন আপনারই জীবন। এই তো এইবার আমি চান করব। খোলা জায়গায়, কুয়োতলায়। সেখানে একটা টগর গাছ

আছে। ফুলে ভরা। সেই গাছে এসে বসে, সেপাই বুলবুলি, ঝোটন বুলবুলি। আমার ভাইপোটা সেই গাছের তলায় আপন মনে খেলে। কোনো দামি খেলনা তার নেই। কিছু কৌটো, আইসক্রিমের গেলাস। কাঠের চামচে, ভাঁড়, নুড়ি। এই নিয়েই সে মেতে থাকে। কখনো হাঁ করে পাখির দিকে তাকিয়ে থাকে। মাটিতে গর্ত খুঁড়ে জল ঢেলে পুকুর নয়, সমুদ্র তৈরি করে। ছোটখাটো কোনো কিছু ওর ভাবনায় নেই। পাহাড়, সমুদ্র, সিংহ, গণ্ডার। ওর ডাক নাম হল বুল। এই বয়সেই ভীষণ একরোখা। ভীষণ গোঁ।

আমার গামছায় গোটাকতক ফুটো রয়েছে। গামছারও কি দাম ! আগে গরিবের লজ্জা নিবারণের পোশাক ছিল গামছা, হাতকাটা গেঞ্জি। পাউরুটি, আলুর দম ছিল গরিবের খাদ্য। এখন কিনতে গেলে দু'বার চিন্তা করতে হয়। একটা পাজামা ছিল। তলার দিকটা ছিঁড়তে শুরু করল ; তখন আমি সার্জারি করে ব্রিকোয়ার্টার করে নিলুম। সায়েবদের ব্রিচেসের মতো ওইটাই আমার স্নানের বেশ। গামছাটা শুধু পরা যায় না। ফুটো অ্যাডজাস্ট করা এক কঠিন অঙ্ক।

অদৃশ্য কোনো চরিত্র খুব অসভ্যতা করায়, বুল তাকে শাসন করছিল, 'দাঁড়াও, তুমি খুব বেড়েছ। তিন দিন তোমার খাওয়া বন্ধ করে দিলেই ঠিক হয়ে যাবে। একটু টাইট দিতে হবে। আদরে একেবারে বাঁদর হয়েছো।'

তার পেছনে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়েছিলুম। হঠাৎ ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল, 'এই যে কাকু !'

আমি তার পাশে বসে পড়লুম, 'কাকে বকছো !'

'দেখো না, আমার কুকুরটা। একেবারে জানোয়ার হয়ে গেছে।'

'কোথায় সে ?'

'ওই যে ! বাবু বারান্দার নীচে বসে আছেন। আমার চটিটার কি অবস্থা করেছে দেখো কাকু !'

বুল একটা দিশি কুকুর বাচ্চা পুষেছে। নাম রেখেছে পম। গট্টাগোট্টা। সাদা রঙ। চোখ দুটো একেবারে দুষ্টুমি মাখানো। বুলের একপাটি জুতো মুখে নিয়ে বসে আছে কান খাড়া করে। কে কি বলছে শুনছে। আর মাঝে মাঝে লেজ নাড়ছে পুটুস পুটুস করে।

'তুমি ওকে জুতোটা নিতে দিলে কেন ?' বুলের পিঠে হাত রেখে জিজ্ঞেস করলুম।'

'ও কারোর কথা কি শোনে কাকু !'

'তুমি কেড়ে নিলে না কেন ?'

'আমি যখন দেখলুম তখন তো আমার জুতো আদ্দেক শেষ। এখন আমি খালি পায়ে ঘুরি। আমার যেমন বরাত। তুমিই বলো, যা দিনকাল পড়েছে আর কি জুতো কেনা যাবে!

আচ্ছা কাকু, জুতো কি খুব ভাল খেতে ? খুব টেস্ট ?'

'বাপি, আমি তো জুতো খেয়েছি পিঠে। মুখে তো খাইনি কোনো দিন। আমার বাবা ছেলেবেলায় দু' একবার জুতো পেটা করেছিলেন, মোটেই ভাল লাগেনি।'

বুল বললে, 'তুমি বুঝি চান করবে ? তাহলে চলো তোমার সঙ্গে আমিও করি।'

বুল আমার সঙ্গেই চান করে। দু'জনেই জল নিয়ে খেলা করতে ভালবাসি। আমি তো কারোর দাসত্ব করি না। নাকে মুখে গুঁজে দশটার মধ্যে অফিসে দৌড়তে হয় না। তারপর সারাদিন আটকে বসে থাকো। আমিই আমার প্রভু। যখন হোক বেরলেই হল। জল নিয়ে রোজই আমাদের ঝটাপটি চলে। যখন খুব বাড়াবাড়ি হয়ে যায়, বউদি ছুটে আসে। একবার আমাদের দু' জনেরই কান মলে পিঠে চড় কষিয়েছিল। বেশ মজা লেগেছিল। বউদির চোখে কাকা, ভাইপো দু'জনেই সমান। মায়ের জাত তো!

'তেলের বাটিটা নিয়ে আয় বুল। দলাইমলাই করে দি।'

'আবার তেল কেন কাকু ? আজ তো আমাদের সাবান মাখার দিন।'

বুল তেল পছন্দ করে না। গা চ্যাট চ্যাট করে। রোজই এই নিয়ে একটু অশান্তি হবে। তখন আমাকে বেনারসের ভীম পহেলবানের গল্প শোনাতে হবে। বেনারস পহেলবানের দেশ। দেয়ালে দেয়ালে পালোয়ানের ছবি আঁকা। ক্লে ভীম পালোয়ান আমার জানা নেই ; কিন্তু রোজই একটু একটু করে তার জীবনী আমি রচনা করে ফেলেছি। বুল জানে ভীম আমার একেবারে কাছের বন্ধু। বেনারসে যখন যাই বেনারসী-পাত্তি জর্দা কিনতে তখন আমি ভীমের বাড়িতেই উঠি। বুলের মতো ভীমেরও এক ভাইপো আছে। এখন থেকেই ভীম তাকে পালোয়ানির ট্রেনিং দিচ্ছে। সে কি কম কঠিন। রোজ ঘষে ঘষে শরীরে আধ সের সরষের তেল ঢোকানো। তারপর পটাপট প্যাঁচ মারা। প্যাঁচ মেরে পটকে দেওয়া। পটকানো শব্দটা বুলের খুব পছন্দ। মাঝে মাঝে খেপে গেলে মাকে বলে, আমি ভীম পহেলবান। তোমাকে আড়াই প্যাঁচ মেরে পটকে দোবো। বউদি বলে, যা যা, সব করবি! বুল তখন দাঁতে দাঁত

চেপে, হাতের মুঠো দুটো কষকষে করে মায়ের ঘাড়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে। জোর কোস্তাকুস্তি। বউদির খোঁপা ভেঙে গেল। আঁচল খুলে গেল। মেঝেতে কাত। বুল ঘাড়ে চেপে গর্জন করছে, তোমাকে আজ আমি ফিনিশ করে দোবো। বুলের ইংরেজির স্টক আমি বাড়িয়েই চলেছি।

ভীমের নাম শুনে তেল নিয়ে এল বুল। বুলকে তেল মাখাতে ভীষণ ভাল লাগে। ঢলঢলে একটা গাছের মতো বেড়ে উঠছে বুলের শরীর। চিকন দেহত্বক। যত তেল ঘষি ততই যেন জ্বল জ্বল করে ওঠে। এই তো বাড়ার কাল। ঠিক মতো যদি খাওয়াতে পারি, বুল একটা হবে। শরীরের সঙ্গে শিক্ষা আর মন জুড়ে দিতে পারলে, এই পরিবার আবার সার্কিটে ফিরে আসবে। নিজের স্বপ্ন চুরমার হয়ে গেলে মানুষ উত্তরপুরুষকে নিয়ে স্বপ্ন দেখে। বুল আর পিউ আমার স্বপ্ন।

বুলকে তেল মাখাতে মাখাতে নিজের হাতের দিকে তাকাই। শিরা উঠেছে। চামড়া আর তেমন টানটান নেই। এইবার ফাটবে, কোঁচকাবে। বয়েস যত হিজিবিজি লিখবে। আমার ভেতরে আমার মায়ের কণ্ঠস্বর শুনতে পাই, প্রসাদ, শরীরের দিকে একটু তাকাও। একটু স্নেহ করো। স্নেহপদার্থ পেটে ফেল। একটু মাখন, দু' চামচ ঘি গরম ভাতে, গোটা কতক বাদাম। কেউ দেখবে না বাবা। নিজেকেই নিজে দেখ। এরপর যে শুয়ে পড়বে।

বউদি আমাকে দেখতে চায়। যথেষ্ট আদর-যত্ন করে। তবে বউদির তো হাত-পা বাঁধা। যেমন টাকা তেমন আলো। ছেলে আর মেয়ে দুটোই বাড়ন্ত। সে দুটোকে সামলে তবেই তো বুড়োদের ব্যবস্থা। বউদির মাথায় অনেক কিছু খেলে। মাঝে মাঝে সাদা তিল বেটে আমাদের খাওয়ায়। স্কিন ভাল হবে।

তেল মাখতে মাখতে বুল বলল 'দেখ, কাকা, আমি এখন বড় হয়ে গেছি তো, তেল নিজে নিজেই মাখবো। আমার লজ্জা করে। আমার একটা প্রেস্টিজ আছে তো!'

'মারবো ঘাড়ে এক রদ্দা। তোর আবার প্রেস্টিজ কি রে আমার কাছে। বোকা পাঁঠা, জানিস না, যারা বড়লোক, প্যাকিং বাকসোয় নোট ভরে রাখে। রাতে কুড়ুড় কুড়ুর করে ইঁদুরে কাটে, তারা হাজার হাজার টাকা খরচ করে রোজ মাসাজ নেয়। মালিশ করার এক্সপার্ট এসে সারা গা অলিভ অয়েল দিয়ে পালিশ করে দেয়। তারা একটা লেংটি পরে চিৎপাত পড়ে থাকে। অনেকে আরামে ঘুমিয়ে পড়ে।'

বুল বললে, 'বড়লোক হলে আমারও লজ্জা করবে না। কাকু আমি তো

বড়লোক হইনি বড় হয়েছি। জানো তো সেদিন টুম্পাদের বাড়ি গিয়েছিলুম। টুম্পার বাবা কত কি খাচ্ছেন। আঙুলের মতো লম্বা লম্বা মাছ ভাজা। কি নাম জানো ? ফিশফিঙ্গার।একটা করে মুখে ঢোকাচ্ছেন আর আধ চোখে চেয়ে বলছেন, তোমার নাম কি ? কোন ক্লাসে পড়ো? খেলাধুলো করো ? পর পর বলছেন, আর গপাগপ খাচ্ছেন। একবারও বললেন না, এই, একে কিছু দে। জান তো কাকু, ওরা হেভি বড়লোক। তিনটে কুকুরে রোজ তিন কেজি মাংস খায়। বড়লোকের নিকুচি করেছে।'

'তুই ওই আস্তাবলে গিয়েছিলিস কেন ?'

'আমি তো মেকানিক।'

'মেকানিক কি রে ?'

'তুমি জান না ? টুম্পার বাক্স মেরামত করতে গিয়েছিলুম।'

'কি বাক্স ?'

'পুতুলের। ডালা খুললেই পিং-পাং বাজনা বাজে। বাজনাটা বাজছিল না।'

'পারলি ?'

'হ্যাঁ। কন্ট্যাক্ট হচ্ছিল না। চাপ মেরে ডালাটা বেঁকিয়ে ফেলেছিল। টিপেটাপে ঠিক করে দিলুম। টুম্পার মা আবার বলছে, আনেক দাম, জাপানী মাল, এইবার মায়ের ভোগে গেল ! মেয়েছেলের কি ল্যাঙ্গোয়েজ কাকা ! মাস্তানদের মতো। সব সময় ঠোঁটে রঙ মেখে থাকে। ব্যাড, ভেরি ব্যাড। টুম্পা ইজ এ গুড গার্ল।'

'বড়লোকদের বাড়িতে কি করতে যাস ?'

'টুম্পা যে আমাকে লাভ করে।'

আমার চোখ ছানাবড়া, 'লাভ করে কি রে ?'

'লাভ জান না ! টুম্পা বলে, আই লাভ ইউ। সেদিন আমাকে কিস্ করেছে।'

'সে কি রে ? সর্বনাশ !'

টুম্পা বললে টিভির মিডনাইট সিনেমা দেখে কিস শিখেছে।'

বেশ কিছুক্ষণ হাঁ হয়ে বসে থাকতে হল। বুলকে কি বলব ? বকব ? শাসন করব ? সেটা করা ঠিক হবে না। একেবারে সরল একটা ছেলে। কোনো পাপবোধ এখনো জাগেনি। যা দেখছে, যা শুনছে, সরল বিশ্বাসে তাই বলে যাচ্ছে। ব্যাপারটাকে পাত্তা না দিলেই হল।

বুল বললে, 'টুম্পার মা কি রকম জামা পরে জানো কাকু ? সব দেখা যায়। টুম্পা বলে, হাই ভোল্টেজ জামা।'

'সে কি রে ?'

'হ্যাঁ গো কারেন্ট মারে।'

আর কোনো কথা নয়, বুলের মাথায় হুড়হুড় করে জল ঢালতে শুরু করলুম। আধুনিক সভ্যতা ধুয়ে মুছে যাক। সেক্স জিনিসটা ক্রমশই জাঁকিয়ে বসছে। ক্যানসারের মতো ছড়াচ্ছে এই সেদিনই পিউ আমাকে জিজ্ঞেস করছিল, 'কাকু গণধর্ষণ কাকে বলে ?' সেদিনের কাগজের খবর। বাঘের মুখে পড়ে মানুষ যেমন ছুটে পালায়, প্রশ্নের মুখে পড়ে আমারও সেই ছুট। পিউ কিশোরী। ভীষণ সুন্দরী। শরীর ফুটছে। হায়নার দল মোড়ে মোড়ে। গণতান্ত্রিক কায়দায় কোনো দিন যদি চেপে ধরে ! কে বাঁচাবে। এ তো 'হলেই হল'-র যুগ। বাড়িতে মাঝরাতে ডাকাত পড়লেই হল। গলার হার, হাত ঘড়ি ছিনিয়ে নিলেই হল। রাস্তায় একদল নিরীহ একজনকে পিটিয়ে দিলেই হল। ভ্যাঁস করে ভুঁড়িতে ছুরির ধার পরীক্ষা করলেই হল। একটু তাড়া ছিল বলে, গাড়ি তিনজনকে পিষে দিয়ে চলে গেল। মিনিতে বাসেতে পুরাকালের রথের দৌড় হচ্ছিল। পরিবারের একমাত্র রোজগারী নববাবু ফুটপাতের ধারে পিচবোর্ড হয়ে গেলেন। সাইকেল রিকশার চালকের হঠাৎ মনে হল, পৃথিবীটা আমার বাপের সম্পত্তি। ভ্যাঁক প্যাঁকা প্যাঁক, ভ্যাঁক প্যাঁকা প্যাঁক এমন চালাল মালুর ঠাকুমা মন্দিরে যেতে গিয়ে এক গুঁতোয় নর্দমায় চলে গেলেন। কারোর মনে হল, তিনতলার ছাদ থেকে একটা আধলা ইঁট রাস্তায় ফেলি, দেখি কি হয় ! গৃহশিক্ষক প্রশান্তবাবু পরমুহূর্তেই মাথায় রুমাল চেপে হাসপাতালে। সাতটা স্টিচ। প্রণবের মনে হল, বউয়ের মুখে বদাম করে একটা ঘুসি মেরে দেখি। সামনের দুটো দাঁত সেই এক বাউন্সারে আজাহারের উইকেটের মতো ছিটকে চলে গেল। মালের ঘোরে প্রণবের চিৎকার, 'হাউজাট, হাউজাট।' কেরোসিনে জল ভেজাল আছে কি না টেস্ট করছে প্রতিমা। গায়ে ঢেলে দেশলাই মেরে দিলে। চ্যালাকাঠ চলে গেল হসপিট্যাল। মহিলা সমিতি এসে স্বামী স্বপনের মাথায় ঢেলে দিলে গোবর জল। পুলিস এসে হোল ফ্যামিলিকে চালান করে দিলে ফাটকে। আমাদের দেশে এখন কমপ্লিট গণতন্ত্র, মনতন্ত্র, ব্যক্তিতন্ত্র, দলতন্ত্র। তন্ত্রমতে দেশ চলছে। খর্পর হাতে কালী নাচে, কারণসেবা করে নয়া কাপালিকরা মুণ্ডু নিয়ে গেণ্ডুয়া খেলছে। প্রেমের তুফান বইছে। প্রত্যেকেরই পেছনে একজন করে, দু' জন করে লাভার। দাদারা সব

ফুটকড়াইয়ের মতো রাস্তায় গড়াগড়ি যাচ্ছে। 'কি করিস ভাই?' 'বে পার্টি করি।' একটু কিছু হলেই হল। এক জোড়া ঢাউস স্পিকার বসে গেল এ-পাশে, ও-পাশে। খোঁটার মাথায় পতাকা। চলল গান, চুমা দে চুমা চুমা।

কর্তাদের কানে তুলো, চোখে চালসের চশমা। লেনস দিয়ে গীতা পাঠ করেন। শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলছেন, 'শোনো গিন্নি কি বলছেন, যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি, মানে ধর্ম যখন কেতরে পড়ে, অধর্ম যখন স্ত্রী হয়ে পুত্র হয়ে, কন্যা হয়ে, নেতা হয়ে, প্রতিবেশী হয়ে, বড় কর্তা হয়ে কাছা কোঁচা খুলে দেয়, তখন তিনি গদা হাতে নেমে আসেন। এসে সব পেঁদিয়ে বৃন্দাবন দেখাবেন।'

গিন্নি হাঁড়োল মুখে দোক্তা ফেলতে ফেলতে বলবেন, 'ও তোমার ঠাকুরদার কাল থেকে শুনে আসছি। পাওনাদার ছাড়া আজ পর্যন্ত কেউ এলোও না, আসবেও না।'

কর্তা বলবেন, 'ওই জন্যে তোমার কিছু হল না বুচু।'

কর্তারা বিয়ের পর যতদিন আদরের মরসুম চলে, তার মধ্যেই স্ত্রীদের একটা করে প্রেমের নাম তৈরি করে ফেলেন। খুব একান্ত মুহূর্তে সম্বোধনের জন্যে। আমার নিজের কোনো অভিজ্ঞতা নেই। শুনে শেখা। নিজের বাচ্চাদের লোকে যেমন করে আর কি! আদর করার সময় হরেক অর্থহীন নাম হেঁচকিতে বেরিয়ে আসে। সেদিন দোতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে এক মহিলা তাঁর কোলের মেয়েকে প্রবল আবেগে আদর করার সময় বলেছিলেন, পুপুর মুনু।

সেইরকম গৃহিণীর নাম বুচু। যৌবন ফিনিশ। কর্ম শেষ। সংসারে ডিগবাজির কাল। অর্থনৈতিক স্বাধীনতা গন্। গন আর দোজ গোল্ডেন ডেজ। পেনসান, ইনডাইজেসান, ক্যাটারাক্ট, হোমিওপ্যাথি, মাউন্টিং ইনসাল্ট। পকেটে ময়লা পাঁচটা টাকা, যক্ষের ধন। নামটা থেকে গেছে। আমার বুচুমনি।

মহিলার নাম আদরে নাদুও হয়। নাদুসনুদুস ছিলেন তিনি। স্বামী সোহাগ করে নাম রাখলেন নাদুমনি। একটু কাঠ কাঠ, খোঁচা খোঁচা চেহারা ছিল। স্বামী বিয়ের পর তৃতীয় রাত থেকেই ডাকতে শুরু করলেন, আমার খুচরমুচর।

বুচু জগদ্দল একটা হাই তুলে বললেন, 'তোমার হয়েছে তো তাহলেই হবে।'

বলে, উঠে গেলেন। সে ওঠাও কি কষ্টের। বাত আর বার্ধক্য একই শব্দ। যত বাত মুখে ছিল সব এল গাঁটে। বাকিটা জীবন তাই পড়ে থাকি খাটে। একটা গান মাঝে মাঝে কানে আসে। সুরটা সুন্দর। সুরহারা দূর নীলিমায়।

সেইরকম, রসহারা রসগোল্লা। রসগোল্লা যদি সাহারায় পড়ে থেকে থেকে একেবারে শুকিয়ে যায় উটের কুঁজের থেকেও বীভৎস তখন। শেষের দিকে মেয়েরা রসহীন, রসগোল্লা। সংসার সব পাংচার করে দেয়। গলায় ব্লিচিং পাউডারের ঝাঁঝ। চোখ দুটো হতাশ গামলা। শরীর চালের বাতার ঘুণ ধরা বাঁশ। ঘরে ঘরে এই ভাঙনের চিত্র।

কর্তারা সব বিকেলবেলায় ধর্মসভায় গিয়ে বসলেন। অধর্ম যত বাড়ছে ধর্মও তত বাড়ছে। একই মুখে চুল, দাড়ির মতো। চুল যত বাড়ছে দাড়ি তত ঝুলছে। চতুর্দিকে আশ্রম। প্রায় প্রতি আশ্রমেই ধর্ম আলোচনা। সার সার বসে আছেন তাঁরা। সাদা পাঞ্জাবি। পুরু কাচের চশমা। মুখে অনিশ্চয়তা। আজ তো গেল, কাল কি হবে রে ভাই। সংসার প্রেসক্রিপসান লিখে দিয়েছে—লে যাও ইসকো। ইনকিওরেবল ওল্ড এজ। লায়াবিলিটি টিল ডেথ। গর্ব করার মতো কিছুই নেই। গর্ব খুঁজে নিতে হয়। কেউ বলবেন, 'আমার জামাই, রত্ন রত্ন। মেরিল্যান্ড-এ আছে। দু'খানা গাড়ি। ওনার অফ টু কারস। মেয়েটা খুব সুখী হয়েছে। রোলিং ইন লাকসারি।' কাঁধ দুটো টান টান হবে। একটু হয়তো সরে বসতে চাইবেন গর্বিত শ্বশুর। মেয়ে কিন্তু চিঠিতে মায়ের কাছে কেঁদে ভাসায়। স্বামী প্রসূনের শতেক অত্যাচারের কাহিনী। শ্বশুর মহাখুশি; কারণ জামাই বছরে একবার আসে। আমেরিকান পুষ্টিতে হৃষ্টপুষ্ট। শ্বশুরমশাইয়ের জন্যে হাঁপানির মাউথ স্প্রে নিয়ে আসে। শাশুড়ির জন্যে আমেরিকান মশলা। লবঙ্গ এক একটা এত বড়। ছোট এলাচ! আজ খেলে টেকুর তিনদিন গন্ধ ছাড়ে। আর দালচিনি? ইউ কান্ট ইম্যাজিন। আর নাতিটা! এই বয়সেই পাক্কা সায়েব। হে-হে বাংলা বলতে পারে না। কলকাতার জল ছোঁয়ার উপায় নেই। খেলেই কলেরা। আমেরিকা থেকে জল নিয়ে আসে। যেই দেখলে জল শেষ হয়ে আসছে, সোজা প্যানঅ্যাম। পোঁও-ও। ডিসটিল্ড ওয়াটারে চান করে। ওরা পারে ভাই। দে ক্যান অ্যাফোর্ড। ডলার তো! ডলারে সব হয়। মানুষ চাঁদে যায়। ভদ্রলোক ছেলের কথা ভুলেও বলবেন না। ছেলে সায়েবী কলেজ থেকে এমন সহবত শিখে এসেছে, বেশির ভাগ সময় হামা দেয়। সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারে না। ড্রাগের আশীর্বাদ। কিছু পেলে না তো এক ফাইল কাফমিকশ্চার মেরে দিলে। পৈতৃক বাড়ি খুলে খাবলা খাবলা হয়ে পড়ে যাচ্ছে। দরজা ধরে টানলে ফ্রেমসুদ্ধ চলে আসে। দেয়ালে পিঠ রাখলে চাবড়া উঠে আসে। একটা একটা করে গয়না বিক্রি হয়ে যাচ্ছে। মারোয়াড়ি,

গুজরাতি টাউটরা জোঁকের মতো লেগে আছে। জায়গায়টার পোজিসান ভীষণ ভাল। প্রেমোটারের স্বর্গ।

এদিকে বক্তা বলে চলেছেন, 'সংসার অসার। সব মায়া। যা দেখছেন তার কোনোটাই সত্য নয়। আপনারা যাকে সত্যজ্ঞানে জড়িয়ে ধরতে চাইছেন, স্ত্রী, পুত্র, পরিবার, জীবিকা, গাড়ি, বাড়ি, যশখ্যাতি, সব স্বপ্ন। এই মোহনিদ্রা যেই ভেঙে যাবে, দেখবেন, আমিও নেই, তুমিও নেই। সব তিনি। সেই এক। সব একাকার। তাহলে আমাদের এই ভ্রম কেন ? কেন আমি আমার আমিটিকে চিনতে পারছি না। কেন ?'

অবসর প্রাপ্ত জেলাশাসকও শ্রোতার আসনে। তিনি আবার বাংলায় একটু উইক। ইংরেজিতে বোঝার চেষ্টা করলেন, হোয়াই আই ক্যান নট ডিসটিনগুইশ মাই আই ফ্রম মাই, কি ? কে জানে কি ? থার্ড মোলার টুথের কেড়িস ভীষণ জ্বালাচ্ছে কদিন ধরে। বাপের নাম ভুলিয়ে দিচ্ছে। যা আদৌ স্বপ্ন নয়।

বক্তা বললেন, 'তুলতে হবে।'

কাতর শ্রোতা ভাবলেন, 'রাইট। দ্যাটস দি দাওয়াই।'

বক্তা বলছেন, 'তুলতে হবে। মন তুলে নিতে হবে। কোথা থেকে ? সংসার থেকে। ধীরে ধীরে সরতে হবে। মন হল লোহা। লোভ হল চুম্বক। সট করে মনকে টেনে নেয়। লোভ কাকে বলে ভোগকে। লোভ এল কোথা থেকে ভোগবাসনা থেকে। ভোগবাসনা এল কোথা থেকে ! আমাদের ইন্দ্রিয় থেকে। ইন্দ্রিয় এল কোথা থেকে ! অন্নময় কোষ থেকে। তা হলে ?'

ঘোষমশাই বসেছিলেন, মনে মনে ভাবলেন, 'বেঁচে গেছি। ডায়াবিটিস, হাই সুগার। বহুদিন ভাত ছেড়েছি। এখন আর অন্নময় কোষ নেই। গম-ময় কোষ। আর আমাকে পায় কে ! এইবার জ্যোতিদর্শন হল বলে।' পাশের চাটুয্যের দিকে একটু অহঙ্কারের দৃষ্টিতে তাকালেন।

এই রকম সভায় আমিও মাঝে মাঝে যাই। হতাশা যখন ভয়ঙ্কর বাড়ে। কিছু লাভ হয় না। জীবনকে স্বপ্ন বলে ভাবতে পারি না কিছুতেই, বরং জীবনস্বপ্নে বুঁদ হয়ে যাই। একেবারেই যে কোনো স্বপ্ন ছিল না তা তো নয়। কত কিই তো হতে চেয়েছিলুম, কিছুতেই হওয়া গেল না। কেউ দিলেও না, নিজের যোগ্যতায় ছিনিয়েই নিতে পারলুম না। সব ব্যাপারেই কেমন এক ধরনের উদাসীনতা। হলে হল। না হলে না হল। মোটামুটি নিজের সঙ্গে একটা রফা করে নিয়েছি। কারোর কাছে হাত পাতব না। যতদিন চালাতে

পারি চালাবো, অচল হয়ে গেলে বসে থেকে থেকে মারা যাবো। জীবন একবার হাত ছাড়া হয়ে গেলে কাটা ঘুড়ির মতো, আর লাটাইয়ে গুটিয়ে আনা অসম্ভব।

বুলের কানে জল ঢুকে গেছে। ঘাড় কাত করে লাফাচ্ছে। ঠাণ্ডা কুয়োর জল গায়ে ঢালছি আমার। বেশ পবিত্র লাগছে। আমাদের বংশের কোনো এক পুরুষ হিমালয়ে বেড়াতে গিয়ে আর সংসারে ফেরেনি। সন্ন্যাসী হয়ে গিয়েছিলেন। সেই উদাসীনতা বোধ হয় আমার মধ্যে ফিরে এসেছে। সবেতেই আছি অথচ কোনো কিছুতেই নেই। যেখানে যার যত ব্যাপার আছে সব আমার ঘাড়ে এসে চাপে। সামাল দি। পর মুহূর্তেই ভুলে যাই। বেরিয়ে আসি। জড়িয়ে পড়ি না। এর নামই কি কর্মযোগ ! নামে কিছু যায় আসে না। নিষ্ঠুরতা, হৃদয়হীনতা না হলেই হল। বড় ছোটলোক হতে চাই না। ছোট বড়লোক হয়ে মরতে চাই।

বুল চলে গেছে। বউদি এসেছে জল নিতে। বউদি আজকাল কাটা হাতা ব্লাউজ পরছে। একটু খোলামেলা থাকতে ভালবাসে। সারাদিন কাজ আর কাজ, পরিশ্রমের শেষ নেই। থেকে থেকেই লোডশেডিং। অভাবেও বউদি সুন্দরী। শাস্ত্রসম্মত সুন্দরী। কিন্তু বুল এইমাত্র সরলমনে যা বলে গেল তাতে সাবধান হবার প্রয়োজন আছে। বউদি বললে, 'তোমার পিঠটা রগড়ে দিয়ে যাবো, এখন একটু ফুরসত হয়েছে।'

'বউদি তোমার বড় হাতা ব্লাউজ নেই ?'

ঘাবড়ে গিয়ে বললে, 'কেন বল তো ? আছে। আগুনের ধারে কাজ তো।'

চুপি চুপি বুল যা বলছিল, বউদিকে বললুম। অবাক হয়ে শুনল। ধনুকের মতো ভুরু আরো ওপরে উঠে গেল। ভয়ে ভয়ে বললে, 'কি হবে ঠাকুরপো !'

॥ দুই ॥

মাঝে মাঝে বউদি আমাকে জোর করে চেপে ধরে, 'আজ তোমাকে না খাইয়ে ছাড়ব না। সাংঘাতিক ভাল রেঁধেছি। সব স্পেশাল আইটেম।' মানুষের মন থাকলে, কত ছোটখাটো জিনিস থেকে বড় সুখ বের করে আনতে পারে ! মাছ, মাংস, ডিম, ইত্যাদি প্রোটিন আমাদের সাধ্যের বাইরে। অনেকটা তীর্থ ভ্রমণের মতো। তীর্থে মানুষ হয় তো বছরে একবার যেতে পারে।

সেইরকম মাসে একদিন হয় তো মাংস হল। পিউ ততটা নয়, বুল মাংস খেতে ভীষণ ভালবাসে। অন্যান্য দিন বউদি লতাপাতার নানা ভ্যারাইটি আবিষ্কার করে। কচুর ডাঁটা, কলমি, নটে, পাটশাক, পুঁই, থানকুনি বাটা, পলতা। শাকের গুণ নয়, হাতের গুণে দুর্দান্ত।

শাকের রকমারি খেয়ে, পেট ফুলিয়ে আমার ঝোলা নিয়ে পথে নেমে এলুম। পথ অমর। মরে না কখনো। পৃথিবীতে কত কি উঠে যায়, দোকান, হোটেল, প্রতিষ্ঠান। কোথাও কোনো পথ উঠে গেছে, এমন কখনো শোনা যায় না। সেই গ্র্যান্ড ট্র্যাংক রোড়, বিটি রোড়, সার্কুলার রোড, চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ। আরো আরো। সব অমর। পথ মানে অনন্ত মানুষের অনন্ত চলা। আমার অনেক সময়, তাই এই সব কাঁচা ভাবনা ভাবার সময় আমি পাই। বেশ আনন্দও হয়, যেন কত বড় এক দার্শনিক! নিজের আনন্দে নিজে মাতোয়ারা।

ভালো খাওয়া হলে একটা পান খাই। বিশুর দোকানে। বিশুকে আমি জর্দা সপ্লাই করি। বিশু আমাকে ফ্রি পান খাওয়ায়। একটু সুখ দুঃখের কথা হয়। বিশু আবার রাজনীতির এক্সপার্ট। নিজের ভাবনার চেয়ে দেশের ভাবনায় বেশি উৎসাহ।

পানে চুন মাখাতে মাখাতে বললে, 'সেন্টার টেকবে?'

আমি ফেরিঅলা। আমার গুরু মহিম হালদার বলেছিলেন, প্রসাদ তোমার লাইনে যদি উন্নতি করতে চাও, সবকিছু একটু একটু করে জেনে রাখবে। যে যা আলোচনা করবে তাইতেই ভিড়ে যাবে। দাবা আর তাস খেলাটা শিখবে। পারলে একটু হাত দেখা। ভীষণ কাজে লাগবে।

আমি বললুম, 'মাইনরিটি গভর্নমেন্ট। টেকা শক্ত। দেশের যা অবস্থা শক্তিশালী সরকার দরকার।'

'এ দেশে শক্তিশালী সরকার আর হবে না। জোড়াতালিই চলবে। তেমন দলও নেই, নেতাও নেই। এই যে টাকার দাম পড়ে গেল, রেলের ভাড়া বেড়ে গেল, আমাদের মতো সাধারণ মানুষ কি করবে!'

'কি আর করবে! বুড়ো আঙুল চুষবে, আর গরমাগরম বক্তৃতা শুনবে।'

'এ রাজ্যে তো চাকরিবাকরি নেই। কলকারখানা সব চৌপাট। উঠতি বয়সের ছেলেরা করবেটা কি?'

'কেন পার্টি করবে, চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই করবে। এই বাজারে এক শ্রেণীর মানুষ তো ফুলেফেঁপে ঢোল হচ্ছে। তাঁরাই এদের পুষবে। নেতারা

পুষবে।'

'ওদিকে আত্মহত্যার কেস কি রকম বাড়ছে। ছেলে মেয়েকে বিষ খাইয়ে মা গলায় দড়ি দিচ্ছে। আপনার কি মনে হয়, বি জে পি আসবে?'

'ইসুটা খুব গোলমেলে। ধর্ম তো একটা বড় ফ্যাক্টার। মানুষ যদি একবার ধরে নেয়!'

'আমার তো মনে হয় মানুষ খেয়েছে।'

'দেখা যাক ইউ পি-তে বি জে পি কি করে?'

'রাজীবের মার্ডারটা বড় বেকায়দায় ফেলে দিয়েছে। এর পেছনে বিরাট এক চক্রান্ত আছে।'

'সে তো আছেই। আস্তে আস্তে সব বেরোবে। রথী, মহারথী।'

'সোনিয়া কি আসবে? আমার মনে হয় চলে আসবে, তা না হলে কংগ্রেস বাঁচবে না।'

'আমারও তাই মনে হয়।'

'কি কারবার দেখুন, এতদিন পরে সর্দার বল্লভ ভাইয়ের কথা মনে পড়ল।'

'এ-সবই ভাই পলিটিক্স। কত লবি!'

'ওই দলবাজিই হবে। এদিকে ভাঁড়ে মা ভবানী। সোনা বন্ধক রেখে খাও। রপ্তানি বাড়বে! কি রপ্তানি করবে! মাস্তান ছাড়া এদেশে আর কি আছে!'

'জর্দা আছে? না দিয়ে যাবো কিছু?'

'কাল দিন। চারশো বিশ কিছু দিয়ে যাবেন। আগের পেমেন্টটাও নিয়ে যাবেন। আমি আর বেশিদিন নেই। হয়ে এসেছে।'

'সকলেরই সেই এক কথা। কেউ আর বাঁচার উৎসাহ পাচ্ছে না।'

'আমারটা স্পেস্যাল কেস। আমাকে মরতে হবে আমার মেয়েটার জন্যে। সংসারটাকে একেবারে শেষ করে দিলে। যাঃ শালা মরগে যা।'

বেশি আর এগোবার সাহস হল না। ব্যাপারটা পাড়ায় বেশ ছড়িয়ে গেছে। মেয়েটা দেখতে খুবই ভাল। সেইটাই হয়েছে মহাকাল। সে জেনেও গেছে ওই আগুনে অনেককে পোড়ানো যায়। নিজেও উড়ছে, অন্যকেও ওড়াচ্ছে। একবার বেদম বোমবাজি হয়ে গেছে। ছেলে ধরছে, ছেলে ছাড়ছে। সে এক কেলেঙ্কারি কাণ্ড। আমি দেখলুম, পৃথিবীতে মেয়েদের নিয়েই যত অশান্তি। সংসার করিনি বেঁচে গেছি বাবা।

পান মুখে, বেশ একটা সুখ-দুঃখ ভাব নিয়ে হাঁটছি। এই সেই পথ।

শৈশব, কৈশোর, যৌবন এই পথে হেঁটেছে। এক এক সময় এক এক ভাব নিয়ে। হাঁটার মতো আনন্দের কিছু নেই। চিন্তার শালগ্রাম শিলাটিকে বুকে ধরে পুরোহিতের মতো নিঃশব্দে হাঁট। সব হতাশা তখনকার মতো কেটে যাবে।

রাজার ঝলমলে পোশাকের মতো ঝলমলে রোদ। পুজো আসছে। বাতাসে সেই আগমনবার্তা। ছবির মতো নীল আকাশ। পেঁজা তুলোর মতো ভারহীন মেঘ। মন্থর চলনে দক্ষিণ থেকে চলেছে উত্তরে। সাগর থেকে হিমালয়ে। বছরের এই সময়টায় মন ভীষণ হুহু করে। যত প্রিয়জনের কথা স্মরণে আসে। বাবা, মা, আমার এক দিদি। আমার পরে ছোট একটা ভাই ছিল। কি যে হল, ছেলেটা লিভার শুকিয়ে মারা গেল। শেষের দিকটায় আমাকে বলত, 'দাদা বাঁচবো তো!' জানালার ধারে শুকনো চেহারা নিয়ে বসে থাকত। হাঁটা চলা করতে পারত না। বাইরে সুস্থ, স্বাস্থ্যবান পৃথিবী হই হই করছে। আর গাছের পাতার মতো বিবর্ণ, হলুদ হয়ে আসছে তীর্থ। সে একটা সময় গেছে আমাদের সংসারে! ঝড়! ওই একটা কথা আমি কিছুতেই ভুলতে পারি না, 'দাদা বাঁচবো তো!' একদিন আমাকে ফিসফিস করে বললে, 'দাদা, তুই আমাকে সিমলের সেই বড় দোকানটার দুটো সন্দেশ খাওয়াবি নরমপাকের।'

সকালে বলেছিল। বিকেলে সন্দেশ নিয়ে বাড়ি ঢুকছি। সব থমথমে। ঘরের সামনে চোখে আঁচল চাপা দিয়ে পাড়ার সব মহিলারা দাঁড়িয়ে। ঘরে ঢুকে দেখি, তীর্থ বিছানায় চিৎ হয়ে শুয়ে আছে। মাথার কাছে মা বসে আছেন পাথরের মূর্তির মতো। তীর্থ চলে গেছে। সেই ঘুমে, যে-ঘুম কোনোদিন ভাঙে না। সন্দেশের বাক্সটা জানালার বাইরে ফেলে দিলুম। সেই থেকে সন্দেশ খাওয়া ছেড়ে দিয়েছি। তীর্থর মুখ ভেসে ওঠে চোখের সামনে।।

এই শরৎকালে সবার আগে তীর্থর কথা মনে পড়ে। মিষ্টি মুখ, কোঁকড়া চুল। অসম্ভব বুদ্ধিমান। বাবার খুব আশা ছিল তাঁর এই ছেলেটিকে ঘিরে। ভেবেছিলেন, তীর্থ বড় হয়ে সংসারটাকে টেনে তুলবে। গাড়ির চাকা গর্তে পড়ে গেছে। তীর্থ পাকা ড্রাইভারের মতো টপ গিয়ারে সাফল্যের পথে তুলে আনবে। অখ্যাতি থেকে খ্যাতিতে। বংশের মুখ উজ্জ্বল করবে। তীর্থের মধ্যে বেঁচে থাকবে বাবার নাম। তীর্থর সেই ক্ষমতা ছিল। তীর্থ চলে গেল। সব ফাঁকা। আমরা সেই শূন্যতা আজও বয়ে বেড়াচ্ছি। তীর্থর ধাক্কাটা বাবা আর মা সামলাতে পারেননি। মায়া বললেই কি মায়া হয়ে যায়। জগৎ বড় ঝলমলে সত্য। প্রতিটি ধুলিকণা সত্য। সত্যকে সহজে মিথ্যা ভাবা যায়!

ব্যর্থ চেষ্টা।

কোথায় যাচ্ছি, তা জানি না। হাঁটছি তো হাঁটছিই। এমন একটা জিনিস ফেরি করি যার কোনো মাথামুণ্ডু নেই। নেশার জিনিস হলেও মদ তো নয়। আজকাল পানমশলা বেরিয়ে আমার বারোটা বাজিয়ে দিয়েছে। আজ **আমাকে** কিছু রোজগার করতেই হবে। হাত খালি হয়ে এসেছে। বউদিকে **কিছু টাকা** দিতেই হবে। তেল, মশলা সব ফুরিয়েছে। কাপড় কাচার গুঁড়ো ফুরিয়েছে। বিছানার চাদর ছিঁড়েছে।

বিরাজকে এখানে দেখবো আশা করিনি। বেপাড়ার চায়ের দোকানে বেলা বারোটার সময় বিরাজ টোকো পঁউরুটি তেল গদগদে আলুর দম খাচ্ছে। থেমে পড়লুম, 'কি রে বিরাজ! অফিস?'

'তোর হাতে সময় আছে?'

'আছে। অফুরন্ত সময়ের বাদশা আমি। তুই এই যা-তা জিনিস খাচ্ছিস? সহ্য হবে? আমার তো দেখেই আলসার হয়ে যাচ্ছে।'

'আজ তিন দিন, এই আমার দুপুরের খাওয়া।'

'অফিস?'

'ছেড়ে দেবো। কাদের জন্যে চাকরি করব বলতে পারিস! কোন শালাদের জন্যে?'

'আস্তে আস্তে। আরো লোক আছে শুনতে পাবে!'

'তুই বিশ্বাস কর মাইরি বাড়িতে কাক পক্ষী বসতে পারছে না, যা আরম্ভ করেছে তপতী।'

'এইভাবে কতদিন চালাবি?'

'যতদিন না মরছি। আত্মহত্যার সাহস থাকলে তাই করতুম।'

'প্রেম করে বিয়ে করলি কেন?'

'তুই আর আমার আত্মীয়স্বজনের মতো কথা বলিসনি প্লিজ। শুনে শুনে কান পচে গেল। প্রেম আছে বলেই প্রেম করে। কে আর খারাপটা ভাবে!'

'তুই আমার সঙ্গে চল, আজ একটা ফয়সালা করি। তপতীকে আমি চিনি।'

'তুই কেন, অনেকেই চেনে। কোনো লাভ হবে না। তোর ক্ষমতায় কুলোবে না।'

'তুই চল না। এ দৃশ্য আমার সহ্য হচ্ছে না। তুই কোন বংশের ছেলে জানি!'

'খুব জানি। বাবা দেড়লাখ টাকা দেনা রেখে গিয়েছিলেন। দাতা কর্ণ। শোধ করতে মায়ের সব গয়না বেচতে হয়েছে। বংশ মানে বাঁশ হাড়ে হাড়ে বুঝেছি। তপতীর উড়নচণ্ডী স্বভাব। বলতে গেলেই দক্ষযজ্ঞ।'

'তুই আমার সঙ্গে চল। একটা মিটমাট হয় কি না, দেখতে দোষটা কি?'

'তোকে অপমান করবে।'

'আমার মান-অপমান নেই। তুই চল।'

বিরাজকে কেমন উদভ্রান্ত মনে হল। এক সময় দেখতে সুন্দর ছিল। এখন চুল পাতলা হয়ে গেছে। গাল ভেঙে আসছে। চোখের জ্বলজ্বলে ভাবটা আর নেই। রোদে-জলে পড়ে থাকা বাঁশের মতোখনখনে চেহারা। বিরাজের বিষাদ আমাকে স্পর্শ করে। কি প্রাণ ছিল ছেলেটার! মায়ের আদুরে ছেলে। বিয়ের পর সেই বাপে খেদানো, মায়ে তাড়ানোর মতো, মা খেদানো, বউ তাড়ানো অবস্থা। অসহায় এক জীবন। সংসারে এমন গেঁথে গেছে, পালাতেও পারছে না। মহাভারতের অভিমন্যু এক রূপকের মতো। সংসারী জীব ঢোকার কৌশলটা জানে, বেরোবার কৌশল জানে না বলে, সপ্তরথীতে ঘিরে মারে। ধর্ম সহায় থাকলেও হয় না কিছু। শরশয্যায় শুয়ে আছেন ভীষ্ম। ভীষ্মদেব দেহত্যাগ করবেন। পাণ্ডবেরা শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছেন। পিতামহের চিরবিদায় দৃশ্য। তাঁরা দেখলেন ভীষ্মদেবের চোখে জল। অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে বলছেন, ভাই, কি আশ্চর্য! পিতামহ, যিনি স্বয়ং ভীষ্মদেব, সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়, জ্ঞানী, অষ্টবসুর এক বসু, তিনিও দেহত্যাগের সময় মায়াতে কাঁদছেন। শ্রীকৃষ্ণ ভীষ্মদেবকে একথা বলাতে তিনি বললেন, কৃষ্ণ, তুমি বেশ জানো আমি সেজন্য কাঁদছি না! যখন ভাবছি যে, যে পাণ্ডবদের স্বয়ং ভগবান নিজে সারথি, তাদেরও দুঃখ-বিপদের শেষ নেই, তখন এই মনে করে কাঁদছি যে, ভগবানের লীলা কিছুই বোঝা গেল না। বিরাজ মাতৃভক্ত। রোজ সকালে মাকে প্রণাম করে দিন শুরু করে। মায়ের আশীর্বাদ আজ প্রায় গৃহহারা। মা ঝ্যাঁটা মারেন, বউ মারে বাতের বল্লম। আমার বাবা প্রায়ই বলতেন, ইনস্ক্রুটেব্‌ল আর দি ওয়েজ অফ প্রভিডেনস।

বিরাজ নিজের বাড়িতেই ঢুকতে ভয় পাচ্ছে। সাবেক আমলের বাড়ি, এমনিতেই বিমর্ষ। মানুষের ভুল বোঝাবুঝির ফলে আরো যেন বিষণ্ণ। সংসারের হাসি হল টাকা, কান্না হল নারী। আবার বাবার একটা কথা মনে পড়ছে, হি ড্যান্‌সেস ওয়েল টু হুম ফরচুন পাইপস্। ভাগ্য বাঁশি ধরলে মানুষ ভালই নাচতে পারে।

বিরাজ বললে, 'তুই আগে যা।'

'তোর বাড়ি তুই আগে ঢোক। আমি পেছনে আছি। তোদের সদরের দরজা বন্ধ হয় না! খোলা হাওয়াখানা!'

'কে বন্ধ করবে! এ- বাড়িতে দরজা বন্ধ করা নিয়েও পলিটিক্স। যে খুলবে সে বন্ধ করবে। যার লোক আসবে সে খুলবে। ফলে সব কড়া নেড়ে নেড়ে বিরক্ত হয়ে ফিরে যায়। অনেকসময় কাজের লোক বিরক্ত হয়ে চলে যায়। দু পক্ষই তখন আমাকে কথা শোনায়। কেন আমি খুলিনি! আরে আমি তখন বাথরুমে। তাই থাক শালা খোলা। চোরে যা পারে নিয়ে যাক।

'তোর মা কি একেবারে হাল ছেড়ে দিয়েছেন!'

'বয়েসটা ভাব। কত বয়েস হল! নিজের কাজ সবই করে নিতে হয় নিজেকে। আমি করতে গেলেই তপতী বাড়ি ফাটাবে। এ একধরনের ব্ল্যাকমেল।'

দুজনে বেশ কিছুক্ষণ থমকে দাঁড়িয়ে রইলুম। বিয়ের আগে তপতী তো এমন ছিল না। সুন্দর একটা মেয়ে। ছেলেমহলে যথেষ্ট ডিম্যান্ড ছিল। সেই মেয়ের কি হল! এক হাতে তো তালি বাজে না! চোরের মতো দুজনে ঢুকলুম। সামনে উঠোন মতো একটু বাঁধানো জায়গা। বেশ পরিচ্ছন্ন। একপাশে বাঁধানো বেদীতে তুলসী গাছ। তলায় প্রদীপ জ্বালাবার ব্যবস্থা। সকালে ধুপ জ্বলেছিল, ছাই পড়ে আছে। ধর্ম ধরে আছে বলেই, এ-বাড়ির এত অশান্তি! কলিকাল। যারা পাপ আর অধর্ম করবে তারাই সুখে থাকবে। প্রাচুর্যে, আনন্দে রমরমা।

কোথাও খুব মৃদু রেডিও বাজছে। মিষ্টি সুরে পুরনো আমলের হিন্দি গান। তপতী তার ঘরে বসে রেডিও শুনছে। নিচেটা পুরো খোলা। আমরা গুটিগুটি দোতলায় উঠে এলুম। বিরাজের অবস্থা দেখে হাসিও পাচ্ছে; যেন সিঁদেল চোর। মানুষের ব্যক্তিত্ব না থাকলে এই অবস্থাটা হয়। বিরাজ যদি সিংহের মতো গর্জন করতে পারত, সব আবার সুরে এসে যেত। মিটমিটে আলো, ফিসফিসে লোক, আমার মা বলতেন অসহ্য।

বারান্দার একেবারে উত্তর মাথায় বিরাজের মা বসে আছেন। কিছু একটা করছেন। পায়ের শব্দে ফিরে তাকালেন, 'কি করছেন জ্যাঠাইমা?'

সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁঝাল উত্তর, 'নিজের পিণ্ডি চটকাচ্ছি বাবা।'

চিঁড়ে ধুচ্ছিলেন। পাশেই একটা পেতলের ঘটি। ঝকঝক করছে। পরিষ্কার একটা শিশিতে পরিষ্কার দানাদানা চিনি; 'আপনি চিঁড়ে খাবেন

জ্যাঠাইমা ?'

'ভগবান যেমন মাপিয়েছেন। তুমি হঠাৎ এই সময়ে !'

'বিরাজকে ধরে নিয়ে এলুম।'

'যাও বউয়ের কোলের কাছে শুইয়ে দিয়ে এসো। দেবী পটেশ্বরী।'

থ মেরে গেলুম বৃদ্ধার কথা শুনে। কতটা ক্ষিপ্ত হলে মানুষ এমন অশালীন কথা বলতে পারেন। মৃদু রেডিও নীরব। দরজার সামনে তপতী। কর্কশ গলায় বললে, 'আর আপনি কি রানি ক্ষীর ভবানী ?'

বিরাজের মা বললেন, 'শুনলে ? শুনলে তো ?'

বললুম, 'আপনারা যদি এইরকম করেন, বিরাজ তো মারা যাবে !'

'ও কি বেঁচে আছে বাবা ?একে বাঁচা বলে। বউয়ের ভেড়া।'

তপতী সঙ্গে সঙ্গে বললে, 'ভেড়ার মা ভেড়ী।'

বিরাজের মা সঙ্গে সঙ্গে বললেন, 'তোমার মুখে বাঁ পায়ের ক্যাঁত করে এক লাথি।'

তপতী বললে, 'আপনার মুখে মুড়ো ঝ্যাঁটা।'

এইবার আমার চিৎকারের পালা। দাদা যখন থিয়েটার করত আমাকে গলা চড়াবার একটা কায়দা শিখিয়েছিল। যাতে ঘরদোর সব কেঁপে যায়। আমার সেই ভয়ঙ্কর ধমকে, দুজনেই থতমত। বিরাজ ছিটকে বারান্দার রেলিং-এর দিকে।

বৃদ্ধা হাউহাউ করে কেঁদে ফেললেন, 'আমার হেনস্তাটা তুমি একবার দেখ বাবা। সকাল থেকে রাত আমার মেয়ের বয়সী এই মেয়েটা কি না বলছে। যখন তখন যেখানে খুশি চলে যাচ্ছে। বাড়িতে উটকো লোক ঢোকাচ্ছে। মাতাল, দাঁতাল কে না আসছে। পেটে দুটো বাচ্চা এসেছিল, নষ্ট করিয়ে এসেছে। আমার ভালমানুষ ছেলেটাকে শিখণ্ডীর মতো সামনে রেখে কি না চলছে এই ভদ্রবাড়িতে। আমার ছেলেটাকে করেছে মাগীর দালাল। কর্তা বেঁচে থাকলে এসব হত !'

বৃদ্ধা কাঁদতে কাঁদতে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন, 'তোমরা আছ সবাই, এই পাপের হাত থেকে আমার একটা উদ্ধারের ব্যবস্থা করে দাও বাবা।'

বৃদ্ধা অঝোরে কাঁদছেন। ওদিকে বাটিতে ছলছলে জলে এক মুঠো চিঁড়ে ভিজছে। বৃদ্ধার আহারের সময় এসে পড়ে বিপদ করেছি। এই আমার রোগ। অন্যের ব্যাপারে নাক গলানো। অনেক বুঝিয়েও নিজেকে নিরস্ত করতে পারি না। যখন মনে হয়, সমাজটা এই ভাবে নষ্ট হয়ে যাবে। ঘরে ঘরে

আগুন ! তখন খেপে যাই। ইচ্ছে করে, সব ভেঙে-চুরে শেষ করে দি। সে যে-ই হোক। আমাদের সবই যেতে বসেছে, গৃহশান্তিটাও গেল। সভ্যতার নিকুচি করেছে। প্রাথমিক উত্তেজনা কেটে যাবার পর মনে হয়, ধুস্ কি লাভ। যা যাবে তা যাবে। আমার একার চেষ্টায় একটা জাতি উদ্ধার পেয়ে যাবে ! বোকা পাঁঠা।

তপতীকে বললুম, 'তোমাকে আমি চিনি তপতী, তুমিও আমাকে চেনো। কি শুনছি এসব !'

'ঠিকই শুনছেন। বিয়ে করেছি বলে খাঁচার পাখি নই। আমারও বন্ধুবান্ধব থাকতে পারে। বাড়িতে আসতে পারে। কেউ চা খেয়ে আসবে, কেউ মদ খেয়ে। তাতে হয়েছেটা কি ?'

'তোমার মা, বাবা এখনো বেঁচে আছেন তপতী।'

'প্রসাদদা কলকাতায় এখনো জাদুঘর, চিড়িয়াখানা, মনুমেন্টও বেঁচে আছে।'

'তার মানে ?'

'মানে খুব সহজ। প্রাচীনকে একপাশে ফেলে রেখে নতুন চলে আসে। মানুষ বাস করে জীবনে যাদুঘরে নয়। বুড়োহাবড়ারা বুড়োদের মতোই কথা বলবে। সেই নিয়মে তো আধুনিক যুগ চলবে না। আমি কি গলায় আঁচল দিয়ে তুলসীতলায় প্রদীপ দেখিয়ে কৃষ্ণের শতনাম পাঠ করতে বসব।'

'তা বলে তোমার কাছে বয়সের সম্মান নেই ? তোমার মাকে তুমি ঝ্যাঁটা মারবো বলতে পারতে ?'

'আমার মা আমাকে মাগী বলতে পারত ?'

'তুমি চাইছটা কি ? যা খুশি তাই করে যাবে ? তোমার মা বাবা সমর্থন করতেন ?'

'সমর্থন, অসমর্থন জানি না। আমার স্বাধীনতায় হাত দিলে, আমাকে শেকল পরাতে চাইলে, আমি ছিঁড়ে ফেলবো।'

'তুমি কার বউ ?'

'ওই জানোয়ারটার। বউ মানে সম্পত্তি নয়, পুঁটলি নয়। বউ হল কমরেড, ফ্রেন্ড। তোমার যেমন স্বাধীনতা আছে, আমারও তেমনি স্বাধীনতা আছে। আমি সেবাদাসী নই। ছাড়া কাপড় কাচার জন্যে, বুড়ির গাঁটে বাতের তেল মালিশ করার জন্যে জন্মাইনি।'

'সংসার মানে ক্লাব ?'

'সংসার মানে কারাগার নয়।'

'তোমার মা, বিরাজের মা, আমার মা যদি তোমার মতো হতেন তাহলে আমাদের কি হত!'

'জন্মাতেন না। যেমন আমি। তিনটে ছেলে এরই মধ্যে হতে পারত। হয়নি। হবে না কোনোদিন। কারণ আমি ছাগলি নই। রেগুলার মেয়েদের ম্যাগাজিন পড়ি।'

'ও তুমি ম্যাগাজিন পড়া মেয়ে! স্ত্রী হিসেবে তাহলে তোমার কোনো কর্তব্য নেই?'

'অবশ্যই আছে। স্ত্রী হিসেবে আছে, ঝি হিসেবে নেই। আপনারটা আগে দেখব, তারপর আমারটা আমি দেখাবো; কারণ আমাকে আপনি এনেছেন আপনার বাড়িতে।'

'তুমি তো দুবেলা দুটো ভাত সংসারের জন্যে ফোটাতে পারো! এটা তো একটা মিনিমাম কর্তব্য।'

'সেখানেও বিশাল পলিটিক্স, কোথায় লাগে সেন্টার। আমার হাতের ছোঁয়া ওনার মা খাবেন না, কারণ আমি নাকি বেশ্যা। কি ল্যাঙ্গোয়েজ ব্যবহার করেন জানেন আপনি, বারোভাতারি। বলুন, ভদ্রঘরের প্রবীণার এই ভাষা হল!'

এইবার তপতীর কান্নার পালা। জল নামছে দু গাল বেয়ে। চেহারার সে জেল্লা নেই। শুকনো শুকনো। চুল বাঁধেনি। সাদামাটা শাড়ি। তপতী গলা পরিষ্কার করে বললে, 'রান্নার পাট তাই উঠে গেছে। আমি কি খাই,ক'দিন কি খেয়ে আছি, একবারও কেউ জিজ্ঞেস করেছে! ওর আবার আজকাল কথায় কথায় হাত উঠছে। যে-স্বামী স্ত্রীর গায়ে হাত তোলে সে জানোয়ারেরও অধম। আমার আর কিছু বলার নেই। আপনার বন্ধু স্ত্রীর ভেড়া নয়, মায়ের পুতুল। অলস, অকর্মণ্য। মাসের মধ্যে পনেরো দিন অফিসে যান, পনেরো দিন বারান্দায় বসে রাস্তা দেখেন। মাইনে কেটে ফাঁক।'

হঠাৎ তপতীর গলার স্বর বদলে গেল, 'পৃথিবীটা কি সেকালের মতো সহজ আছে প্রসাদদা! যে স্ত্রীকে পুষতে পারে না, সে হবে ছেলের বাপ! ওই তো আমাকে জোর করে নিয়ে গিয়ে অ্যাবরসান করিয়েছে। নিষ্ঠুর, খুনী। ও জানে না, মেয়েরা মা হতে চায়। মায়ের কাছে এক রকম, আমার কাছে এক রকম, আপনার কাছে একরকম। একজন মানুষ কত রকম হতে পারে আপনার ওই প্রাণের বন্ধুটিকে দেখে শিখুন। আজ মাসের পনেরো তারিখ ট্যাঁক গড়ের মাঠ। মাঝে মাঝে রেসের মাঠেও যাওয়ার অভ্যাস আছে। এটা না কি ওঁর

উত্তরাধিকার। আপনি কার হয়ে মামলা লড়তে এসেছেন প্রসাদদা! একটা কেঁচোর হয়ে! এ সংসারের ধ্বংস অনিবার্য। আপনার কোনো ক্ষমতা হবে না বাঁচাবার। অকারণ চেষ্টা।'

আমি বসে পড়লুম। কেঁচো খুঁড়তে সাপ।

তপতী বললে, 'আরো শুনুন। গোপালকে নিশ্চয় চেনেন। গোপালের বড় বোন, যে স্বামীর ঘর ছেড়ে চলে এসেছে। একসঙ্গে দশ-বিশটা লোককে চরায়, বাসস্ট্যান্ডের কাছে লেডিজ-টেলারিং-এ বসে, আপনার বন্ধু এখন সেই রূপসীর খপ্পরে পড়েছেন। সেদিন একটা বারে দুজনকে বিয়ার খেতে দেখা গেছে। মিটমিটে শয়তান। দুঃখের কাঁদুনি গেয়ে পাপ আর কত চাপা দেবে! আমাকে আর ভাল লাগছে না। আমি যে পুরনো হয়ে গেছি। নিত্য নতুন মেয়ে চাই, এদিকে ট্যাঁকের জোর নেই। রাবিশ!'

তপতী দুম করে দরজা বন্ধ করে দিল। আমি পড়ে গেলুম বেকায়দায়। এ-সমস্যার তো সমাধান নেই। তপতী যথেষ্ট তেজী, স্পষ্টবাদী মেয়ে। জ্যাঠাইমা উবু হয়ে বসে আছেন। ফ্যালফ্যালে দৃষ্টি। বিরাজ ধরা পড়ে গেছে। অপরাধীর মতো মুখ।

উঠে পড়লুম। বিরাজকে বললুম, 'তুই শেষে ওই মেয়েটার পাল্লায় পড়লি! তিনটে পরিবরাকে যে শেষ করেছে। তার ওপর ঘোড়া রোগ! তোকে তো পথে বসতেই হবে।

বিরাজ বললে, 'তুই তপতীর কথা বিশ্বাস করলি?'

'একালের ছেলেদের চেয়ে মেয়েদের কথা আমি বেশি বিশ্বাস করি। তোর মুখ বলছে, তুই অপরাধী। আমি তোকে একদিন বাজে গলি থেকে বেরোতে দেখেছি। মানুষ নিজের ভাগ্য নিজে তৈরি করে। তোর মায়ের জন্যে আমার দুঃখ হয়।'

বৃদ্ধাকে কিছু বলা প্রয়োজন। 'জ্যাঠাইমা।'

তিনবার ডাকার পর চোখ তুলে তাকালেন, 'ছেলের স্নেহে অন্ধ না হয়ে বউয়ের সঙ্গে হাত মেলান। দুজনে মিলে একে একটু শাসন করুন। জেনে রাখবেন ওই বউই আপনাকে দেখবে। মেয়েটা সাচ্চা।' বৃদ্ধার ঠোঁট কাঁপতে লাগল।

আবার পথে। পথের মতো সুন্দর জায়গা পৃথিবীতে দুটো নেই, আর হল গাছতলা। নদীর মতো কোনো কিছু বেশিক্ষণ ধরে রাখে না। গলগল করে লোক চলেছে। এই সময় এত লোক। বোধ হয় খেলা আছে বড় দলের।

ঠিক তাই। উত্তেজিত আলোচনা। যারা এই সব নিয়ে মেতে আছে বেশ আছে। কিছু সময় জীবন ভুলে থাকা।

বাস স্ট্যান্ডে এসে গেলুম। উল্টো দিকেই সেই লেডিজ টেলারিং। চোখ চলে গেল। সেই মহিলা কাউন্টারে। কি আছে! মানুষ পাগল। বেশ খুঁটিয়ে দেখতে লাগলুম। তপতী অনেক সুন্দরী। একটাই তফাৎ। এর আকর্ষণী শক্তি অনেক বেশি। শরীর দেখাতে জানে। মানুষকে বেপরোয়া করে তোলে। নেশা ধরায়। বাস এসে গেল।

মহিম হালদারের দোকানে যথারীতি আড্ডা চলেছে। এই একটা মানুষ। কালটাকে ধরে রেখেছেন। গরদের পাঞ্জাবি। মিহি ফিনফিনে ধুতি গলায় সোনার চেন। আট আঙুলে আটটা আংটি। বুড়ো আঙুল দুটোকে ভগবান কাঁচকলার মতো করে দেওয়ায় আংটির বন্ধন থেকে মুক্ত। যার এতগুলো গ্রহ খারাপ তিনি কেমন করে এমন ধনী হলেন। হৃষ্টপুষ্ট, সদা হাস্যময়। আবার উদার, পরোপকারী, দাতা। কে জানে সবই পাথরের গুণে কি না! আমার পয়সা নেই বলে বিশ্বাসও নেই।

সেই দরাজ সম্বোধন, 'এসো রামপ্রসাদ।'

'আজ্ঞে শুধু প্রসাদ।'

'তাই তো হল গো। রাম মানে এক। তুমি ছাড়া কলকাতায় আর দ্বিতীয় প্রসাদ কাকে জানি ?

'আজ্ঞে বিখ্যাত একজন রবীন্দ্র সংগীত গায়ক আছেন।'

'আহা, তাঁকে তো আমি চিনি না। যাক আসন গ্রহণ করো। তুমি কি একটু মোটা হয়েছ ?'

'বোধ হয় ?'

'ভাল-মন্দ খাচ্ছ ?'

'না। চিন্তা না করে মোটা হয়ে যাচ্ছি। যা হয় হোক, হলে দেখা যাবে। এই ভাবেই চালাচ্ছি।'

'বেশ করছ। ভাবলেই বিপদ। কুলকিনারা পাবে না। এই দেখ না, গুণে গুণে দেখলুম, আমার এক ডজন রোগ। যতগুলো অঙ্গ, ততগুলো রোগ। তা কি করব! ভেবে মরবো! না, খেয়ে মরব! মহিমদা হাঁক মারলেন, 'সরকার।'

ওপরের সিলিং থেকে একটা মুখ ঝুলে পড়ল। মহিমদার মাথার ওপর মাল থাকে। মুখ বললে, 'দাদা ?'

'এইবার বের করো গুলাব জামুন।'

'বউদি মিষ্টি খেতে বারণ করেছেন।'

'সে বিধবা হওয়ার ভয়ে। তিনটে তীর্থ এখনো বাকি আছে। মাল নামা। বাড়িতে যদি বলিস, পুজো আসছে, তোর বোনাস কেটে নোবো।'

জিজ্ঞেস করলুম, 'আপনার সুগার এখন কততে আছে ?'

'সে খবরে তোমার কি দরকার ছোকরা। তুমি কি চিনির আড়তদার! যে খায় চিনি তাকে যোগান চিন্তামণি। আহা, চিন্তামণি। কেমন নামটা বলো তো! সেকালের মেয়েমানুষদের অমন নাম হত। একবার খোঁজ নাও তো ওই নামের কেউ আছে কি না পাড়ায়! একদিন জমিয়ে ফুর্তি করে আসি।'

'বউদির কানে গেলে কি হবে জানেন, এই বুড়ো বয়সে!'

'আরে খাতির বেড়ে যাবে আমার। তোমার বউদির যা চেহারা হয়েছে! ঠিক যেন পাশবালিশের মুণ্ডু গজিয়েছে। গলা দিয়ে শব্দ বের করতেও কষ্ট হয়। মানু, মানু বার দশেক ডাকার পর, কুঁক করে একটা শব্দ। স্রেফ আইসক্রিম খেয়ে খেয়ে মোটা হয়ে গেল। পরামর্শ দিলুম, মানু একটু কমাও। আজকাল বিউটি পার্লার হয়েছে, সেখানে গিয়ে বাইক চালাও। লজ্জা করে, বলে শুয়ে পড়ল। তার পরে বললে, তোমার কোলে মাথা রেখে যেন এইভাবেই যেতে পারি। একেই বলে প্রেম। আমি একটা নতুন নাম রেখেছি, মিসেস ঝুনঝুনওয়ালী। খুব খেপে যায়। বলে, যৌবনে আমি নাচতুম, জানো কি ? অতীতে তুমি কি ছিলে জেনে লাভ কি, বর্তমানে তুমি একটি ব্যারেল।' গুলাব জামুন নামটা শোনা ছিল। কখনো হয় তো খেয়েওছি, খাশ দোকানের এমন সুস্বাদু জিনিস আগে খাইনি। অভিনেত্রীদের কুমকুম মাখা লাল গালের মতো।

ক্ষীরের গোল্লা খাঁটি ঘিয়ে ভাজা। মনে হচ্ছে স্বর্গের ফুলবাগানে বসে ঈশ্বরের দেওয়া ভোজ খাচ্ছি। ঈশ্বরের বিবাহবার্ষিকী।

মহিমদা বললেন, 'ক্ষীরের সঙ্গে খাঁটি ঘি, বুঝতেই পারছ, ব্যাপারটা গুরুপাক।'

একটা খেয়ে হাত গুটিয়ে বসে আছি। বাড়ির কথা মনে পড়ছে, পিউ, বুল, বউদি, দাদা। বউদি একদিন রাঙালুর পাস্তুয়া করেছিল, তাই কি আনন্দ! যেন উৎসব হচ্ছে।

'ভয়ে খাচ্ছ না ?'

'না, তা নয়, ভাল কিছু মুখে তুলতে গেলেই বাড়ির কথা মনে পড়ে যায়।'

'ঠিক আছে, দুটো টিন তোমাকে দিয়ে দিচ্ছি।'

'না, সেটা হয়ে যাবে ভিক্ষে।'

'মারবো শালা এক লাথি নিতম্বে। মহিম সকলের মহিম। আমি শালা একার জন্যে পৃথিবীতে এসেছি!'

সরকার মশাই দু'টিন প্যাক করা মিষ্টি আমার সামনে রেখে গেলেন। প্যাকিং দেখলেই শ্রদ্ধা হয়। মহিমদা বললেন, 'মাঝে মাঝে কি ভাবি জান, আমার তো ছেলেপুলে নেই, চোখ বোজালেই ব্যবসা, বিষয়সম্পত্তি সব পাঁচ ভুতে মেরে দেবে। তোমাকে আমি দত্তক নিয়েনি। মেয়ে থাকলে ত কথাই ছিল না, জামাই করে ফেলতুম। ব্যাপারটা আমি সিরিয়াসলি ভাবছি। আমি আমার ফ্যামিলির অ্যাভারেজ বয়েস অনেকদিন পার করে বসে আছি। ডাক এল বলে। না, না, আমি তোমার কাছে স্বপ্ন বিক্রি করছি না। তুমি ভাবছ বাংলা সিনেমার গল্প শোনাচ্ছি, না তাও না। সারাটা জীবন ভয়ঙ্কর একা লড়াই করার পর আমার একটু সেবা পাওয়ার ইচ্ছে হয়েছে। মৃত্যু চিন্তাও এসে গেছে। উঃ, সেই কবে পৃথিবীতে এসেছি। ইডেন গার্ডেনে বাবার হাত ধরে, ব্যান্ড স্ট্যান্ডে গোরা ব্যান্ড শুনতে যেতুম। ফার্পো বলে একটা হোটেল ছিল। তাদের আইসক্রিম ছিল বিখ্যাত। আর একটা বিখ্যাত আইসক্রিম ছিল হ্যাপি বয়। বড় বড় কিসমিস দেওয়া ফার্পোর মিল্ক ব্রেড ছিল বিখ্যাত। হোয়াইটওয়ে লেভল, ডিপার্টমেন্টাল স্টোরস। মেমসায়েব সেল্‌স ওম্যান। হল অ্যান্ড এন্ডারসন। ঝকঝকে চৌরঙ্গি, পার্কস্ট্রিট। মেট্রো সিনেমার কার্পেটে পা ডুবে যায়। সিসিল বি ডি মিলের ছবি। ফোর্ড গাড়ি। হাতে টেপা হর্ন। চোঙটা বাইরে ঝুলছে। ভঁক ভঁক শব্দ। সে এক মায়া শহর, ইংরেজের কলকাতা। যাঃ শালা, এখন সব পেচ্ছাপে ভাসছে। কোথা থেকে এসে গেল সব ভুক্কার পার্টি। একদম চৌপাট। যা দেখেছি আর যা দেখছি, সহ্য করা যাচ্ছে না। তোমরা দেখনি ভাল আছ। আমাদের এখন যাওয়াই ভাল। মোহরের মালা পরে পায়খানায় বসে থাকার সুখটা কোথায়! আজ দুধ বন্ধ, কাল জল বন্ধ, পরশু বাংলা বন্ধ, হাত কাটছে, পা কাটছে, মেরে নর্দমায় ফেলে দিচ্ছে। না ভাই খুব হয়েছে, আর দরকার নেই। আমাকে যেতে দাও। আমার মা এসে আমার হাত ধরে নিয়ে যাবেন, চল্ মহিম। জানো, আমার মা শিক্ষিতা ছিলেন। শান্তিনিকেতনের প্রথম ব্যাচের মেয়ে। যেমন নাচতেন তেমন গাইতেন। মা শেষের দিকে একটা গান রোজই গাইতেন, সেই গান আমি এখন গুনগুন করি :

'আর কত দূরে আছে সে আনন্দধাম।
আমি শ্রান্ত, আমি অন্ধ, আমি পথ নাহি জানি ॥
রবি যায় অস্তাচলে আঁধারে ঢাকে ধরণী
করো কৃপা অনাথে হে বিশ্বজনজননী।

'রবীন্দ্রনাথ ইজ গ্রেট।'

মহিমদার চোখে জল। ধবধবে ফর্সা রুমাল বের করে চোখ মুছলেন। আরো জল। রুমাল দিয়ে চোখ ঢাকা অবস্থায় বলতে লাগলেন, 'কিছুই না কতকগুলো শব্দ। চির প্রশ্ন, আর কত দূর? কি কত দূর? সেই আনন্দধাম। সেথা নাই কো মৃত্যু, নাই কো জরা। আকাশ গীতি গন্ধ ভরা। আর একটা কথা, রবি যায় অস্তাচলে। ছুটির দিন, শীতকাল। বারান্দায় বসে আছি। বেলা পড়ে আসছে। রোদ সরছে। পাচিলের গায়ে, গাছের মাথায় হঠাৎ দেখি নেই। দিন চলে গেল। যায় শুধু যায়। যায় শুধু যায়, ধন, জন, জীবন, যৌবন। অতৃপ্ত বাসনা লাগি ফিরিয়াছি পথে পথে/ বৃথা খেলা, বৃথা মেলা, বৃথা বেলা গেল বহে ॥ শব্দ দিয়ে কোথায় নিয়ে যাওয়া যায়, রবীন্দ্রনাথ তা দেখিয়ে দিয়েছেন।'

ফোন বাজল। মহিমদা রিসিভার তুললেন। মুহূর্তে ভাব পরিবর্তন। মুখের চোহারা পাল্টে গেল। একেবারে অন্য মানুষ। মহিমদা বলছেন, 'শয়তানি করলে মরবে। কোনো কথা আমি শুনবো না। ঠিক আছে, তাহলে কোর্টেই দেখা হবে। হয়ে যাক, কার প্যাঁচের জোর কত বোঝা যাবে। মহিম হালদার স্ট্রেট লোক, যুগ যতই পাল্টাক চোরকে কেউ সাধু বলবে না। শোনো শোনো, অভিধানে দুটো শব্দই থাকবে। যত বড় নেতাই হোক, চোরকে কেউ সাধু করতে পারবে না। না না ক্ষমাটমা নেই। কোর্টেই ফয়সালা হবে।'

মহিমদা রিসিভার ফেলে দিলেন। কিছুক্ষণ স্তব্ধ। চেষ্টা করছেন আগের ভাবে ফিরে আসতে। ফিক করে হেসে বললেন, 'এ আর এক মহিম। অসাধু, অসতের যম। প্রসাদ তোমার হাতে সময় আছে?'

'মহিমদা, আমার তো ওই একটাই আছে। সময়ের কোটিপতি আমি। বলুন, কি করতে হবে?'

'আমার সঙ্গে একটা জায়গায় যেতে হবে।'

'চলুন। এখন যাবেন?'

'রাইট নাউ।'

মহিমদা নিজেই গাড়ি চালান। পুরনো মডেলের গাড়ি। ঝকঝকে,

টিপটপ। বাঘের বাচ্চার মতো ইঞ্জিন। সেক্ষে হাত ছোঁয়ানো মাত্র ইঞ্জিন লাফিয়ে উঠল। মহিমদা বললেন, 'কয়েকটা ব্যাপারে আমি সায়েব, গাড়ি, বাড়ি, আর কথার দাম। আমাদেরও একটা কথা আছে, মরদকি বাত, হাতী কি দাঁত। সে মরদও গেছে, বাতও গেছে। এখন আছে পলিটিক্যাল বাত। বুড়ীর মাথার পাকাচুল। ছেলেবেলায় খেয়েছ? স্কুলের গেটের পাশে। ফুরফুরে চিনির সুতো। হাল্কা এতখানি। চাপ দাও এইটুকু একটা গুলি। মটরের দানা। একালের সবই যেন পাল তোলা, কথার বাতাসে ভেসে চলেছে।'

মহিমদার গাড়ি তুলনাহীন। যেন বেহালা বাজাচ্ছেন। খাঁজ খোঁজ দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছেন নর্তকীর মতো। পাশে বসে দেখছি, কি ক্যালকুলেশান! রেড রোড। রবীন্দ্রসদন। গাড়ি দক্ষিণে চলেছে।

হরিশ মুখার্জি রোডের পুরনো আমলের একটা বাড়ির সামনে মহিমদা থামলেন। সন্ধে হয়ে এসেছে! কার্নিশে গোটা কতক পায়রা ঝটাপটি করছে। বাড়িতে লোকজন মনে হয় কম। খুবই নিস্তব্ধ।

দরজার ফ্রেমের ওপরের দিকে গোল একটা ফুটো। সেই ফুটো গলে একটা মোটা দড়ি ঝুলছে। মহিমদা দড়ি ধরে টানলেন, ভেতরে কোথাও একটা ঘণ্টা বেজে উঠল। দরজার ওধারে অদ্ভুত একটা শব্দ। কেউ যেন তালে তালে কাঠ ঠুকছে। শব্দটা দরজার ওপাশে থামল। ছিটকিনি খোলার শব্দ। দরজা খুলে গেল। সামনে দীর্ঘকৃতি এক মানুষ। খ্রাইস্টের মতো মুখ। লম্বা লম্বা চুল। সাদা ট্রাউজার, সাদা টি শার্ট। এক বগলে একটা ক্রাচ। ভদ্রলোকের মুখে ঝলমলে হাসি খেলে গেল। প্রবীণ মানুষ। তিনি বললেন, 'আরে মহিম এসো এসো। তোমার কথাই ভাবছিলুম। কেমন আছ?'

'খুব একটা খারাপ নেই। মোটামুটি সবই কন্ট্রোলে আছে। আচ্ছা, আমার খুবই প্রিয় এই ছেলেটির সঙ্গে আপনার পরিচয় করিয়ে দি। এর নাম প্রসাদ।'

প্রবীণ মানুষটি বললেন, 'এসো ভাই। তোমাকে এক হাতে নমস্কার করছি। নমস্কার না বলে, স্যালুট বলাই ভাল। একটা হাত আমার এখন পায়ের কাজে লাগছে।'

ঘরের পর ঘর, তারপর ঘর, ক্রমশই আমরা পূর্বদিকে চলেছি। প্রতিটি ঘরে বড় বড় অয়েল পেন্টিং ঝুলছে। ভদ্রলোক শিল্পী। নিস্তব্ধ বাড়িতে ক্রাচের শব্দে চমকে চমকে উঠছে, যেন কোনো নিলামঅলা হাতুড়ি ঠুকছে। একেবারে শেষের ঘরটা স্টুডিও। আমরা সেই ঘরে বসলুম। ইজেলে একটা ছবি

অর্ধসমাপ্ত।

মহিমদা বললেন, 'আপনাকে কোর্টে যেতে হবে। আমিই সে ব্যবস্থা করব। সিধে আঙুলে ঘি উঠবে না।'

'কি বলতে চাইছে?'

'সোজা কথা, এক নেতাকে ভিড়িয়েছে। গোটা জমিটাই জবরদখল করতে চাইছে। চাইছে কি? করে ফেলেছে। প্রথমে বলেছিল ক্লাবের জন্যে কাঠা দুয়েক ছেড়ে দিলেই হবে।'

'ক্লাব! ক্লাব মানে তো আটচালা, একটা ক্যারামবোর্ড, একটা টেলিভিশান আর আড্ডা।'

'হ্যাঁ। আর যে কোনো ছুতোয় মাইক বাজানো। যুব জাগরণের পীঠস্থান। সে যাই হোক। এখন বলছে খেলার মাঠ হবে। ওই জমি। ওখানে এখন আশি-নব্বই হাজার টাকা জমির কাঠা। এক বিঘের ওপর জমি। ইয়ার্কি নাকি! আপনার এই অসহায় অবস্থা। কোনো ইনকাম নেই। এই বাড়ি পড়ে আছে সেকেন্ড মর্টগেজে। আপনার মতো একজন শিল্পী, তাঁর একটা স্টুডিও, গ্যালারি, স্মৃতি কিছুই থাকবে না! এই সব অপূর্ব ছবি নষ্ট হয়ে যাবে! ইদানীং ছবির চাহিদা বেড়েছে।'

'ছবির সমঝদার বাড়েনি ভাই। বেড়েছে ক্রেতা। তুমি ব্যবসা করো, ব্যাপারটা তুমি বুঝতে পারবে। সাদা কালোর রহস্য তো জান। শোনো মহিম, এই পৃথিবীতে তুমি ছাড়া আমার কেউ নেই। তোমার দয়ায় আমি বেঁচে আছি।'

'এই কথা না বলে আমাকে জুতো মারতে পারতেন! আপনাকে আমি দয়া করি? আমি আপনার সেবা করি। আপনার বিদেশী বউ আপনাকে ত্যাগ করেছে। ছেলেমেয়ে সেখানে। নিঃসঙ্গ এক মানুষ। আপনি আমার বাবার পোর্ট্রেট এঁকেছিলেন। যে দেখে সেই প্রশংসা করে। এমন জীবন্ত মনে হয় এই বুঝি চোখের পাতা পড়বে! আমি যদ্দিন আছি তদ্দিন আপনার ভয় নেই। তার পর?'

'মহিম, তোমার কি ধারণা, তুমি আমার আগে যাবে?'

'মৃত্যু নিয়ে আদিখ্যেতা নেই আমার। ভাবিও না। কিন্তু মন বলছে, তেল ফুরিয়ে এসেছে।'

'বিশটা বছর বিদেশে ছিলুম। হাসতে হাসতে মরা দেখেছি। শোনো, ও কোর্টকাছারি করে লাভ নেই। জমির আশা ছাড়। তুমি বরং এই সব ছবির

একটা ব্যবস্থা কর। কিনবে না কেউ, ভাল কারোকে বিলিয়ে দাও।'

'প্রসাদকে কেন এনেছি জানেন ? এই শীতে আপনার ছবির একটা প্রদর্শনী করব।'

'কী লাভ ?'

'একা নিজের জগতে থাকতে থাকতে আপনি উদাসীন সন্ন্যাসী। বিস্মৃতি থেকে স্মৃতিতে ফিরিয়ে আনাটা আমরা আমাদের কর্তব্য বলে মনে করি। এখন বলুন আপনার স্টোরে কি কি ফুরিয়েছে ?'

'এইটাই আমার লজ্জা।'

'আচ্ছা, মনে করুন আমি আপনার সব ছবি কিনে নিয়েছি। ইনস্টলমেন্টে দাম দিচ্ছি।'

লম্বা লম্বা চুলে আঙুল চালাতে চালাতে শিল্পী প্রতুল বোস বললেন, 'সবই বোধ হয় ফুরিয়েছে।'

'আজ কি খেয়েছেন ?'

'প্লেন অ্যান্ড সিম্পল ওয়াটার।' হা হা করে হাসতে লাগলেন শিল্পী। হাসি থামিয়ে বললেন, 'যত বড় শিল্পীই হও মহিম এ-দেশে ঠিক জায়গায় ঠিক তেল দিতে না পারলে, ইউ স্টার্ভ অ্যান্ড পেরিশ। যে অয়েল, ওয়াটার, টেম্পারা, প্যাস্টেল, লিথো কিছুই বোঝে না, তাকে খাতির করে মদ খাওয়াতে হবে, তবেই সে তোমার আর্টকে তুলে ধরবে, তবেই তুমি কষ্কে পাবে, তবেই তোমাকে লক্ষ্মী ধরা দেবেন। দিস ইজ দি সিস্টেম। তুমি সেই দেশে আমার ছবির এগজিবিশান করবে ! এর চেয়ে বোকামি আর কি হতে পারে। বুড়ো বয়সে আমাকে গালাগাল খাওয়াবে। উল্টোপাল্টা যা খুশি লিখে দেবে।'

'আমি মদের ফোয়ারা ছোটাবো। সবাই খারাপ নয়। শিল্পবোদ্ধা সমালোচক এখনো আছেন। আপনি একটু সিনিক হয়ে গেছেন। প্রদর্শনীর কথা পরে হবে। আগে আপনার উপবাস ভঙ্গের ব্যবস্থা হোক। প্রসাদ !'

'বলুন মহিমদা।'

'তোমার এ মিষ্টি উত্তর শোনার জন্যে হাজার বছর বাঁচতে রাজি আছি। প্রসাদ, চলো ব্যবস্থা করি।'

'আপনি বসুন, সব আমি করছি।'

'কি করবে ?'

'প্রথমে চা, চিনি, দুধ। তারপর পাঁউরুটি, মাখন, ডিম, ফ্রোজেন চিকেন, আলু, পেঁপে, শসা, টোম্যাটো, ভাল চাল, তেল, মশলা, কফি।'

প্রতুলবাবু বললেন, 'কেমন করে তুমি আমার প্রিয় খাদ্য জানলে প্রসাদ ?'

'আপনি যে বিদেশে ছিলেন অনেকদিন।'

প্রতুলবাবুর বাড়ি থেকে বেরোতে বেশ রাতই হয়ে গেল। সব গোছগাছ করা সহজ কাজ নয়। পরিচ্ছন্ন বিলিতি কায়দার রান্নাঘর। গ্যাস, ওভেন সবই সুন্দর। এক বিদেশিনীর হাতের স্পর্শ বোঝা যায়। অয়েলে সেই সুন্দরীর ক্যানভাস দেখলুম। এখন তিনিও বৃদ্ধা। বৃদ্ধ শিল্পীর শরীরে আর সে উন্মাদনা নেই। ইন্দ্রিয় ঘুমিয়ে পড়েছে। জেগেছে অতীন্দ্রিয় অনুভূতি। মোটর দুর্ঘটনায় একটি পা জখম হয়ে গেছে। এক পায়ে ক্রাচে ভর দিয়ে যা পারেন তাই রাঁধেন। কতটা পথ চলে এলুম, তাও চোখের সামনে ভাসছে। খ্রীস্টের মতো এক মানুষ ক্রাচে ভর দিয়ে এগিয়ে আসছেন। পেছন থেকে আলো পড়ে সাদা চুল রুপোর মতো ঝকঝক করছে। একা থাকেন ওই অত বড় একটা বাড়িতে। সমস্ত ছবি তখন জীবন্ত চরিত্র। আমি হলে ভূতের ভয়ে মরে যেতুম।

মহিমদা বললেন, 'তোমাকে কোথায় নামাবো ? বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসবো ?'

'পাগল হয়েছেন ? তাহলে আপনাকে আজ আর বাড়ি ফিরতে হবে না। লরি ছেড়ে দিয়েছে। টালার ব্রিজে আটকে বসে থাকবেন তিন ঘণ্টা।'

'তাহলে তুমি এইখানেই নেমে পড়ো।' হেদুয়ার উল্টো দিকে বেথুনের সামনে গাড়ি দাঁড়াল। মহিমদা বললেন, 'শোনো, তোমার দুটো হোমটাস্ক, এক, ওই জায়গাটা উদ্ধারের ব্যাপারে একটা পথ ভাবো। দুই, আমার প্রস্তাবটা, আমি এইবার ধীরে ধীরে সরব, আর তুমি ঢুকবে। আমার পাশে একজনকে চাই। ভাব, প্রসাদ ভাব। আচ্ছা, তোমার কথা তো শোনা হল না। কেন এসেছিলে ?'

'টাকা নেই। পেমেন্ট আটকে গেছে। মাল তুলতে পারছি না।'

মহিমদা ফোলিও খুলে দশটা একশো টাকার নোট দিয়ে বললেন, 'চলবে ?'

'চলবে। কাল আমি তাগাদায় বেরিয়ে, আরো কিছু তুলে নোবো।'

'মার্কেট খুব টাইট। বুঝলে, ইলেকসান, ডিভ্যালুয়েসান, রাজীব হত্যা, মাইনরিটি গভর্নমেন্ট, ইনফ্লেসান, লোডশেডিং, ক্লোজার, লক আউট, আমার শরীরে যত ব্যাধি, দেশের শরীরে তার ডবল।

একেবারে ফোঁপরা কেস। যাও, সাবধানে।'

মহিমদা ডান দিকে ঘুরে গেলেন। বিডন স্ট্রিট দিয়ে সার্কুলার রোডে

পড়বেন।

চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলুম কিছুক্ষণ। আমার পাশেই দুহাত দূরে আখের ছিবড়ের আগুনে এক ফুটপাতবাসিনীর রান্না বসেছে। একটা বাচ্চা চিত হয়ে ধুলোয় পড়ে ঘুমোচ্ছে। আর একটা অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে লকলকে আগুনের দিকে। একটা আধুনিক সংগীতে এই জীবন কত রোমান্টিক, পথেই জীবন, পথেই মরণ আমাদের। এই পরিবারের কর্তাটি একপাশে বসে আছে নিশ্চেষ্ট হয়ে। পরনে এক ফালি গামছা। বিড়ি ফুঁকছে। যে দেয়ালে পিঠ রেখেছে, সেটি একটি প্রাচীন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। এদেশের নারীরা শিক্ষিতা হবে। সামনে রাজপথ, মহামানবের নামাঙ্কিত। সামনেই উদ্যানমণ্ডিত সরোবর। সকালে সুদেহীরা আসবে সাঁতারে, যাদের জন্যে দূরদর্শনের পর্দায় যাবতীয় হেল্‌থ-ফুডের এলাহি বিজ্ঞাপন। মধ্যবিত্ত বিরাজ ম্যানেজ করতে পারবে না বলে স্ত্রীর সন্তানকে ভ্রূণেই হত্যা করল। আর এরা ? কি সাহসী ! পথেই জনম, পথেই মরণ আমাদের। পরোয়া করি না সভ্যতার। শিক্ষার দিকে পেছন করে উন্নত জীবনকে সামনে রেখে জীবনের আদিম লীলা। প্রোটিন, ভিটামিন, নিউট্রিসান, ইনফেকসান, স্যানিটেসান, এডুকেসান, সে কোন দূর জগতের কথা। এই ভাল, এই ভাল। কিছুটা দূরে অন্ধকারে ঝপ করে একটা আগুন জ্বলেই নিবে গেল। নাকে এল গাঁজার গন্ধ। হঠাৎ মনে পড়ে গেল গাঁজার স্তোত্র। এক সন্ন্যাসী আমাকে শিখিয়েছিলেন। সেই স্তোত্র আওড়াতে আওড়াতে শ্যামবাজারের দিকে হন্টন,

গাঁজা চ গঞ্জিকা গাঞ্জা ত্বরিতানন্দদায়িনী।
সংবিদামঞ্জরী চৈব ইতি তে নামপঞ্চকম ॥
সদ্যদুঃখৌঘসংহন্ত্রী সদ্যশ্চিন্তাবিনাশিনী।
সুখদা ধ্যানদা গাঁজা গাঁজৈব পরমাগতিঃ।
সংসারাসক্ত চিত্তানাং সাধূনাং গঞ্জিকে সদা।
দুশ্চিন্তা-বিস্মৃতের্হেতুঃ ত্বং হি লক্ষ্মীবিরোধিনী !
অভূৎ পক্ষী প্রসাদাত্তে রূপচাঁদো জরায়ুজঃ।
ইতি তে মহতী শক্তিঃ বঙ্গেষু পরিবিশ্রুতা ॥

হাতিবাগানের ভিড় ছেড়ে গেছে। চট আর প্লাস্টিক ঢাকা সার সার কুশ্রী স্টল রাতের মতো পাট গোটাতে ব্যস্ত। বড় বড় স্টিলের ট্রাঙ্কে মাল বোঝাই হচ্ছে। বেশির ভাগই যুবক। গালাগালের চুমকি বসিয়ে মডার্ন ডায়ালগ ছাড়ছে। আগে অস্বস্তি হত, এখন খারাপ লাগে না। আগামী দিনের ভাষা।

ছেলে তখন বাবাকে বলবে, 'তখনই তোমাকে আমি বললুম বে রানিং ট্রেনে ওঠার চেষ্টা কোরো না। কেলিয়ে পড়লে। ব-এ ছড়াছড়ি। হয় তো পাঠ্যপুস্তকে আগামী দিনের শিশুরা পড়বে,

সকালে উঠিয়া বে বলি জোরে জোরে,
সারাদিন আমি যেন ধান্দা করে চলি,
আদেশ করেন যাহা মোর গুরুজনে,
আমি বে বুড়ো আঙুল চুসে দি মুখে ॥

পথের পাশে মিত্রা সিমেনার গায়ে গুড়গুড়ে রোলকাউন্টার। ছেলেটি চিৎকার করছে, লাস্ট রোল, পড়ে আছে গোল।' দমকা একটা সুগন্ধ নাকে এল। ফিরোজা শাড়ি পরা মাখনের মতো এক মহিলা পক্ষীরাজের মতো এক পুরুষের শরীরে ভেলক্রোর মতো সেঁটে চলেছেন। সুখী পরিবার হাতে হাতব্যাগ।

॥ তিন ॥

শ্যামবাজার ট্রামডিপোর কাছটা চির অন্ধকার। কাপড়, ক্যাসেট, প্লাস্টিকের জিনিসপত্রের স্টল সব বন্ধ হয়ে গেছে। কেবল মোড়ের মাথার ওষুধের দোকানটা খোলা। আমার ঠিক আগে আগে এক প্রবীণ কোনো ক্রমে হেঁটে চলেছেন। ডান অঙ্গে প্যারালিসিস। ডান পাটা অতি কষ্টে টেনে টেনে নিয়ে যাচ্ছেন। ডান হাতটা শরীরের পাশে ঢিলে হাতার মতো লটরপটর করছে। বাঁ হাতে আবার একটা প্লাস্টিকের ব্যাগ। তার মধ্যে সামান্য কিছু জিনিসপত্র। শরীরের হেঁচকিতে ভয়ঙ্কর দুলছে। খুব চেনা মনে হচ্ছে, যদিও পেছন দিক থেকে দেখছি। এগিয়ে গিয়ে সামনের দিক থেকে দেখলুম। যা ভেবেছি তাই। আমাদের ষষ্ঠীতলার হরিদাসবাবু। এই এত রাতে অক্ষম একজন বৃদ্ধ কোথায় গিয়েছিলেন ! এখন ফিরবেন কি ভাবে ! বাসের সংখ্যা কমে এসেছে। দোকান ভাঙা, সিনেমা, থিয়েটার ভাঙা, আড্ডা ভাঙা, সুঁড়িখানা ভাঙা বিপর্যয় ভিড়।

'জ্যাঠামশাই আপনি ?'

বৃদ্ধ থমকে দাঁড়ালেন। শরীর কাঁপছে। মুখ ঘামে জবজবে। অসহায় চোখের দৃষ্টি।

'আমাকে চিনতে পারছেন না ? আমি প্রসাদ।'

বৃদ্ধ জড়ানো গলায় যা বলতে চান বোঝা কঠিন। জিভে জড়তা। বৃদ্ধ বললেন, 'আমার স্ত্রীর একটা অপারেশন হবে। তা না হলে সে বাঁচবে না। টিউমার পেটে, পেটে। এই এত বড়।'

'বুঝতে পেরেছি।'

'সব রক্ত শুষে নিচ্ছে। শরীর সাদা। অ্যানিমিয়া।'

'তা অপারেশান হবে। আপনি এই অবস্থায় বেরিয়েছেন কেন?'

'ভিক্ষে করতে। টাকা লাগবে তো অনেক। ছ হাজার।'

খুব সুন্দর সাজপোশাক। মুখে সিগারেট, হাতে ব্রিফকেস। বৃদ্ধকে এক ধাক্কা মেরে বাসের দিকে এগিয়ে গেলেন। টাল খেয়ে পড়ে যাচ্ছিলেন, কোনো রকমে ধরে ফেললুম। না, বলার কিছু নেই। শহর বড়ই অসুস্থ। এ ব্যাধির নাম, দৃষ্টিহীনতা, মূঢ়তা। এ ব্যাধির নাম, আত্মবিস্মৃতি। এডসের মতোই মারাত্মক।

রাস্তার আরো ধারে হরিদাসবাবুকে টেনে নিয়ে এসে আড়াল করে দাঁড়ালুম। সেই হেদোর কাছ থেকেই তিনটে ছেলে আমাকে অনুসরণ করে আসছে। জানি কেন। মহিমদা যখন আমাকে টাকা দিচ্ছিলেন গাড়ির আলোটা জ্বলছিল। ওরা ছিল ফুটপাতে। এক পুলিস অফিসার আমাকে ভালবাসেন। তিনি সাবধান করে দিয়েছিলেন, রাত নটার পর একটা গ্যাং অপারেট করে এই রিজিয়ানে। ওদের অনেক মেথড। কোথা থেকে একটা মেয়ে এসে বিপদের ভান করে জিজ্ঞেস করবে, 'আপনি কোন দিকে যাবেন?' তুমি যেদিকে যাবে সেও সেইদিকেই যাবে। দু চারটে সাধারণ কথার পরেই চিল চিৎকার, 'কি বললেন?' সঙ্গে সঙ্গে গ্যাং ঝাঁপিয়ে পড়বে ঘাড়ে। গায়ে উগ্রগন্ধী বাংলা মদ ঢেলে দেবে। যাতে পাবলিককে বোঝানো যায়, লোকটা বদ মাতাল। সব কেড়ে নিয়ে পালাবে। রাস্তা আরো নির্জন হয়ে এলে তো কথাই নেই। একজন গলার কাছে ধরবে, বাকি দুজন সব সাফ করে নেবে। অনেক সময় সাদা পোশাকের পুলিস বলে ঘিরে ধরবে, দেখি ব্যাগে কি আছে! শহরের রাতটুকুই তো রোজগারের ছাতা। অন্ধকারই মূলধন। ছেলে তিনটে সুযোগ খুঁজছে। এও এক সাধনা!

বৃদ্ধ কানে একটু কম শোনেন। জিজ্ঞেস করলুম, 'আপনাকে কেন ভিক্ষে করতে হবে? আপনার ছেলেরা?'

'বড়টার সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই বাবা। সে তো তার নিজের সংসার নিয়ে বাইরে। মেজ কিছুই করে না। মাঝখান থেকে বিয়ে করে বসে আছে।

ছোটটা ঘষটাচ্ছে। স্কুল ফাইনালের বেড়াটাই টপকাতে পারলে না। মেয়ের বিয়ে বাকি। আমার নিজের এই অবস্থা। আমার কি শুয়ে থাকলে চলবে?'

'কিছু পেলেন?'

'যৎসামান্য। ভায়রাভাইয়ের ভাল অবস্থা। কান্নাকাটি করায় হাত রগড়ে দিলে কিছু। পুরোটাই দিতে পারত। সব ঘরে একটা করে টিভি। দুটো গাড়ি। ছেলেমেয়ে দুজনেই বিলেতে। তবু নাকে কান্না। বড়ই নাকি অভাব। বড়লোকেরা বড় গরিব হয় বাবা।'

'কি করে বাড়ি যাবেন?'

'চেষ্টা করব, না পারলে বসে পড়ব। একদিন না একদিন ঠিক পৌঁছে যাবো।'

'আসুন আমার সঙ্গে।'

কলকাতার ট্যাকসি টালা পেরিয়ে উত্তরে যেতে অতিশয় ভীত। বাগবাজারের কাছ থেকে শাটল ট্যাক্সি পাওয়া যায়। টলটলায়মান যাত্রী। পকেট থেকে টাকা বের করার সময় চারপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে ট্যাক্সিচালকরা এমন জীবই পছন্দ করেন। বৃদ্ধকে নিয়ে গুটি গুটি সেই দিকে এগোচ্ছি আর ভাবছি, যে জায়গার দিকে যাচ্ছি আরো সাংঘাতিক। যা হয় আমার কাছে কিছু আছে, হাতে প্রায় হাজার টাকার মতো জর্দা। বৃদ্ধর কাছেও কিছু আছে। কলকাতার পকেটমাররা জাদু জানে।

পাঁচ মাথাটা অতি কষ্টে পেরিয়ে পেট্রলপাম্প বরাবর গেছি, একটা জিপ এসে দাঁড়াল। পাশে। কি ভাগ্য আমার। সেই পুলিশ অফিসার ড্রাইভারের পাশে। তিনি নেমে এলেন। প্রায় ফুট ছয়েক লম্বা। দৈত্যের মতো চেহারা।

'প্রসাদ তুমি? সঙ্গে?'

'আমার এক প্রতিবেশী।'

'গিয়েছিলে কোথায়?'

'আমি গিয়েছিলুম আমার ধান্দায়। দেখি হরিদাসবাবু এই অবস্থায় টাল খেতে খেতে আসছেন। ফেলে যাই কি করে? এখন চেষ্টা করছি কিভাবে ফেরা যায়!'

'তোমাদের তাহলে অ্যারেস্ট করি! সহজ সমাধান। আমি ডানলপ যাচ্ছি। আজ ওখানে ডাকাত সমাবেশ। নাও ওঠো।'

পেছন দিকে উঠতে হবে; বিশাল উঁচু। অসহায় বৃদ্ধ তাকিয়ে আছেন।

সামনে বসে অফিসার তাড়া লাগাচ্ছেন। আমি কোলে করে হরিদাসবাবুকে তুলে দিলুম। একেবারে হাল্কা ফংফংয়ে। তড়াক করে নিজেও লাফিয়ে উঠলুম। হাঁটুটা একটু ঠুকে গেল। কাটলও মনে হয়। জিপ একটা ঝাঁকুনি মেরে এগিয়ে গেল।

বৃদ্ধর কাঁপাকাঁপা বাঁহাত আমার হাতে এসে পড়ল। ডান হাতটা একেবারেই অসাড়। বৃদ্ধ জড়ানো জড়ানো গলায় বললেন, 'তোমার মতো যদি একটা ছেলে থাকত আমার!'

মাঝে মাঝে আলো পড়ছে হরিদাসবাবুর মুখোশের মতো মুখে। পেপার পাল্পের মুখোশ হয়, রবারের হয়, এ যেন বিষণ্ণতা জমিয়ে তৈরি। মাছের মতো দুটো চোখ। জল গড়িয়েছে। প্ল্যাস্টিকের ব্যাগটা পায়ের কাছে দুলছে।

'কি আছে ওই ব্যাগে জ্যাঠামশাই?'

'কয়েকটা বেদানা কিনেছি বাবা বুড়ির জন্যে। বেদানায় শুনেছি খুব আয়রন আছে। হয়তো বাঁচবে না। কত অত্যাচার করেছি, কত রাত জাগিয়েছি, কত ভোগ করেছি, কত সেবা নিয়েছি। আমি আজ জাঙ্ক, ডেবরিস। এক সময় আমি পাহাড়ে উঠেছি, আর আজ তুমি আমাকে কোলে করে তুললে, হায় বরাত!'

আলো অন্ধকারে বসে আছেন এক প্রেমিক। আমার বউ নেই। দাম্পত্য জীবনের গভীরতা আমি কি বুঝবো! আমার পৃথিবী আকাশের মতো খোলামেলা। তবু মনে হল, এই জনারণ্যে, এই হৃদয়হীনতায় কি ভাবে একজনের সঙ্গে আর একজন বাঁধা পড়ে যায়। চারটে দেয়াল, নরম আলো, নরম অনুভূতি, নির্ভরতা, নিরাপত্তা, দুঃখ, সুখ, আশা, স্বপ্ন। বাইরে বৃহতের অট্টহাসি, নৃশংসের নিষ্করুণ নৃত্য। একটা হিন্দিগান মনে পড়ছে, দো হংস কি জোড়া, বিছোড় গয়ারে।

বিটি রোডের একটা জায়গায় আমরা নেমে পড়লুম। বাকিটা পথ সাইকেল রিকশায় মারবো। হরিদাসবাবু ওই অবস্থায় কাঁপতে কাঁপতে এগিয়ে গিয়ে অফিসারকে বললেন, 'আই অ্যাম গ্রেটফুল টু ইউ।' তিনি ঠিক বুঝতে পারছিলেন না, আমি বুঝিয়ে দিলুম। অফিসার হেসে বললেন, 'দিস ইজ মাই ডিউটি।' জিপ বেরিয়ে গেল ডানলপের দিকে। আমরা বাঁদিকে ঢুকে গেলুম।

ঘুটঘুটে অন্ধকার। আলো চোখের পক্ষে ক্ষতিকারক বলেই অন্ধকারের ব্যবস্থা। কোদলানো রাস্তা। সেটাও ওই ব্রতচারীর যুগ ফিরিয়ে আনার জন্যে,

চল কোদাল চালাই ভুলে মানের বালাই। আর একটা কারণ, ঈশ্বর বিশ্বাসী করে তোলা। গাঁক গাঁক লরি, পন পন মিনি, ঘুটঘুট স্কুটার, প্যাঁক প্যাঁক রিকশা, ঝ্যাড় ঝ্যাড় সাইকেল, অন্ধকারে ঘাড়ে ঘাড়ে, তখন একমাত্র মন্ত্র, রাখে কেষ্ট মারে কে, মারে কেষ্ট রাখে কে।

হরিদাসবাবুর দোর গোড়ায় রিকশা থামল। আধখেঁচড়া বাড়ি। সম্পূর্ণ হবার আগেই বার্ধক্য নেমেছে। ঝনঝনে দরজা। কতকাল রঙ পড়েনি। বাইরের প্ল্যাস্টার গর্ত গর্ত। একটা লতানে গাছ একতলার ছাতে উঠেছে। পাকানো চেহারায় সংগ্রামের চিহ্ন। জুঁই গাছ। একটা দুটো ফুল ফোটাতে কসুর করেনি।

দরজা খুলে সামনে দাঁড়ালেন হরিদাসবাবুর স্ত্রী। স্বামীকে দেখে প্রবীণা ডুকরে কেঁদে উঠলেন, 'তুমি আর আমাকে কত শাস্তি দেবে? আমাকে বাঁচাবার আগে নিজে বাঁচো।'

মেয়ে এসে বাবার হাত ধরল। যেই শুনলেন আমি আগলে আগলে নিয়ে এসেছি, আবার পুলিসের জিপে করে, মেয়ের মার হাত ধরে টানাটানি। একটু বসে যেতেই হবে,

'রাত হয়েছে, আমি আর একদিন আসব।'

আমি পথের মানুষ। যতক্ষণ বাইরে, ততক্ষণ আমি ফর্মে, সংসার দেখতে ভাল লাগে না। ইঁদুর কলের মতো। কম আলো, কম পরিসর, কম বাতাস, দেয়ালে দুঃখের চুনকাম, সিলিং-এ ভাগ্যের টিকটিকি, আলনায় অতীতের আলখাল্লা, মশারি মৃত্যুর জাল, বিছানা শ্মশানের চিতা, জলপড়ার শব্দে আয়ুক্ষয়। আমার বউদির সংসার ছাড়া আর কোনো সংসার ভাল লাগে না। বউদি ছাড়া আর কোনো মেয়েকেও ভাল লাগে না।

মা আর মেয়ে দু'জনের টানাটানিতে ঢুকতেই হল।

অনেকে শীতকালে প্যাঁটরা থেকে কোট বের করে পরেন। একসময় খুব দামি সার্জ কিনে বড় দোকান থেকে করিয়েছিলেন বা শাল বের করে গায়ে চাপান, দোরোখা কাশ্মীরি জিনিস। বনেদী ব্যাপার। অবস্থা পড়ে গেছে। ধুতিটা মোটা, জামা যেমন তেমন, শালটা দামি; কিন্তু কাজের জেল্লা মরে এসেছে। জায়গায় জায়গায় ফুটো, সেরকম নরমও নেই। এই পরিবারটিও সেইরকম। যেটুকু ছিল সেইটুকুকেই রক্ষার আপ্রাণ চেষ্টা। দেয়ালে এতখানি পেণ্ডুলামঅলা রাগী ঘড়ি টকটক করছে। সায়েবী আমলের দেরাজে কাজ করা পেতলের হাতল। তেঁতুল দিয়ে মাজা ঝকঝকে। তার ওপর চিকনের ঢাকা।

পেল্লায় খাট। মাথার কাছে ময়ূরপঙ্খী। বেলজিয়াম গ্লাসের আয়না। সময়ের কলঙ্ক জায়গায় জায়গায় ফুটে আছে। চেয়ারের পেছনটা বিশাল লম্বা। আড়ষ্ট হয়ে বসলুম। হরিদাসবাবুর মেয়েটি খুব ঘরোয়া। কোনো চালচলন নেই, অহঙ্কার নেই। দেখতেও সুন্দরী। কিন্তু ভীষণ অসহায়ের ভাব চোখে-মুখে। যেন আগুন লেগেছে শাড়ির আঁচলে। আমি চুপ করে বসে আছি, সে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে খাটের মাথার কাছে। হরিদাসবাবু এতক্ষণের ধকলে প্রায় সংজ্ঞাহারা। হরিদাসবাবুর স্ত্রী স্বামীর কপালে হাত বোলাচ্ছেন। জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমার নাম কি বাবা?'

'প্রসাদ।'

'টাইটল।'

'চট্টোপাধ্যায়।'

'আমরা মুখোপাধ্যায়। কুলীন ব্রাহ্মণ আমরা।'

মেয়ের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তুমি দাঁড়িয়ে আছ কেন মা? দেখ কি আছে, প্রসাদদাকে দাও।'

এইটাই বিপদ। রাত-বিরেতে বাঙালির আতিথেয়তা।

হাত জোড় করে বললুম, 'মা, আমি এখন কিছু খেতে পারবো না। আমার পেটের অবস্থা ভয়ংকর।'

'মেয়েটি বললে, 'একটা নারকোল নাড়ু, এক গেলাস জল। সামান্য। খুব সামান্য।'

মেয়েটির মুখ খুবই করুণ। কোনো দামি জিনিস হাত ফসকে পড়ে ভেঙে গেলে মুখের অবস্থা যেরকম হয় ঠিক সেইরকম। দুঃখের আগুনে রোস্ট করা। সব অহঙ্কার ঝরে গেছে। কাল কি হবে জানা না থাকলে যে সাত্ত্বিকতা আসে চেহারায় তা ফুটে আছে। দীর্ঘ শরীর। যৌবনের ছড় পরানো।

মেয়েটি কথা বলার সময় চোখের একটি সুন্দর ভঙ্গি করে। তাতে কোনো চেষ্টা নেই। স্বাভাবিকভাবেই হয়ে যায়। অন্তর যাদের ভাল, তাদের এমন হয়। গলাটা ভীষণ মিষ্টি। উচ্চারণ স্পষ্ট। হঠাৎ মনে হল, আমি প্রেমে পড়ে গেছি। বাবার হাত ধরে আমাদের গ্রামের ক্ষেতে যখন বেড়াতে যেতুম তখন দেখেছি চাষারা আলের একটা জায়গায় যেই গর্ত করে দিলে অমনি চুঁই চুঁই করে জল আসতে লাগল। আমার ভেতরেও কোথাও যেন একটা আল ভেঙে গেল। চুন চুন শুনতে পাচ্ছি। হাসলে গালে টোল পড়ে।

মেয়েটি বললে, 'একটা খেয়ে দেখুন না কেমন করেছি। কর্পূর দিয়েছি।

একটাতে তেমন পেট ভার করবে না।' আবার সেই হাসি, আবার সেই চোখের সুন্দর ভঙ্গি।

বললুম, 'আচ্ছা, দিন তাহলে।'

মেয়ের মা বললেন, 'উমাকে আপনি বলছ কেন বাবা? তোমার চেয়ে অনেক ছোট।' যে চেয়ারে বসে আছি, সেই চেয়ারে একসময় ভেলভেটের গদি ছিল। এখন পিঁজে গেছে। বুননের মোটা মোটা শির ক্লিষ্ট পাঁজরের মতো জেগে আছে। ঐশ্বর্য আর যৌবন এক স্বভাবের। কিছুতেই থাকতে চায় না। পিছলে পালায়।

উমা ঝকঝকে পদ্মকাটা একটা রেকাবিতে ধবধবে সাদা দুটো নাড়ু নিয়ে এল। ঝকঝকে গেলাসে জল। এই জেল্লাটুকু ভাল লাগল। টাকায় সংসারের জেল্লা, ছাইয়ে কাঁসার বাসনের জেল্লা। সেইটুকু যারা করতে পারে তাদের মন মরে যায়নি।

'আমি দুটো কি খেতে পারব উমা?'

'একটা যে দিতে নেই প্রসাদদা, ফাঁকা ফাঁকা লাগে। এক একটা তো ছুনিগুলির মতো। খেয়ে দেখুন, খারাপ লাগবে না। খুব করে বেটেছি।'

সারা মুখে চাঁদের আলোর মতো ছড়ান হাসি। চোখের সেই অপূর্ব ভঙ্গি। বড় বড় চোখের পাতার দীর্ঘ ছায়ায় টলটলে দুটো চোখ। মরেছে, আমি ক্রমশই দুর্বল হয়ে পড়ছি। আমার নেশা ধরছে। আমার স্বপ্ন আসছে। পাহাড়, নদী, উপত্যকা, নীল পাহাড়, ঘাসে ঢাকা ঢালু জমি, গোল হাতে চুড়ির কিনিকিনি, মাঝ কপালে চাঁদের টিপ, চূর্ণকুন্তল, ভরাট পায়ের গোছ, ভরসার মতো বর্তুল নিতম্ব, থোড়ের মতো ওপর বাহু, ও দয়াল বিচার করো, আমায় গুণ করেছে, আমায় খুন করেছে, ওই হাসি।

রাগী ঘড়ি সময়ের হাতুড়ি ঠুকছে। পল, দণ্ড, মুহূর্ত পায়ে পায়ে চলেছে। এগিয়ে যাও, এগিয়ে যাও, যে যেখানে আছ এগিয়ে যাও মৃত্যুর দিকে। আর না, আমার বউদি আমার অপেক্ষায়, আমার না ফেরার দুশ্চিন্তায় ছটফট করছে। পিউ আর বুল একই বিছানায় নিদ্রার নদীতে ময়ূরপঙ্খীর মত ভাসছে। দাদা এই সময় আয়েস করে দিনের শেষ সিগারেটটি খায়। আমাদের টিভি নেই। একটা রেডিও আছে। সেই রেডিয়োয় দূরের কোনো স্টেশান ধরে কল্পনায় বুঁদ হয়ে থাকে, 'ওই শোন, ওই শোন জার্মানী, আমেরিকা, ইতালি, স্পেন, লাহোর', যেন সেই দেশে চলে গেছে। ঘরদোর সব ভেঙে পড়েছে। ছাত উধাঁও। ইন্টার ন্যাশন্যাল ট্রাঙ্ক রোড চলে গেছে

শোওয়ার ঘরের ভেতর দিয়ে। দাদা এক জিপসি। সংসারের ক্যারাভ্যান নিয়ে নাচতে নাচতে চলেছে।

উমা হাত বাড়িয়ে গেলাস আর রেকার্বিটা আমার হাত থেকে নিয়ে নিল। সেই সময়েই এক ঝলকের দেখা, কি সুন্দর গোল গোল হাত। লম্বা লম্বা শিল্পী আঙুল। মহিমদা আমাকে জোর করে একটা আংটি পরিয়েছিলেন ব্যবসাপত্তর ভাল হওয়ার জন্যে। মনে হল আংটিটা খুলে অনামিকায় পরিয়ে দি। যে-আঙুলে যা মানায়।

উমা দরজা ধরে দাঁড়িয়ে, আমি পথে। পেছনের আলোয় উমাকে মনে হচ্ছে মন্দির ভাস্কর্য। খুব মিষ্টি গলায় উমা বললে, 'প্রসাদদা, বাবাকে আপনি কোথায় পেলেন ?'

'শ্যামবাজারে। একা একা অতি কষ্টে আসছেন।'

'জানেন তো মাঝে মাঝেই এইরকম বেরিয়ে যান হুট হুট করে। আমি যদি কোনো কাজে যাই তখনই এই কাণ্ডটা হয়। সেদিন বললেন, আমাকে কালো কোট পরিয়ে দাও, আবার আমি এজলাস কাঁপিয়ে আসি। আগে কথা একেবারেই বোঝা যেত না, এখন অনেক চেষ্টা করে একটু পরিষ্কার হয়েছে। প্রসাদদা, আপনি আবার আসবেন তো !'

'হ্যাঁ আসব বই কি, মায়ের অপারেশানের ব্যবস্থা করতে হবে তো। শোনো বাবাকে তুমি একেবারে একা ছাড়বে না বাইরে। হাঁটাতে হলে নিজে নিয়ে বেরোবে।'

'আমার মাকে মা বলেছেন, দেখবো কেমন আসেন।'

হঠাৎ মনে পড়ে গেল, আমার ঝোলায় দু'টিন গুলাব জামুন আছে। একটা টিন বের করে উমার হাতে দিলুম। কিছুতেই নেবে না। হাত দুটো কোলের মধ্যে লুকিয়ে ফেলেছিল। সেই হাসি, 'না, আপনি আপনার বাড়ির জন্যে নিয়ে যাচ্ছেন।' মুখটা একপাশে ঘোরানো। খোঁপাসুদ্ধ প্রোফাইলটা একেবারে ছবির মতো। মাথায় প্রচুর চুল। আমি দুঃসাহসী, কোলের কাছ থেকে হাতটা টেনে বের করলুম, 'ধরো, শিগ্‌গির, তা না হলে আমি আর আসব না। আমারও আছে।'

টিনটা বুকের কাছে ধরে উমা দাঁড়িয়ে রইল। আমি তার অতল দৃষ্টির পথ বেয়ে অন্ধকারে হারিয়ে গেলুম। আরো কিছুটা দূরে আমার এক নীড়। হঠাৎ সেই কবিতা। জীবনানন্দ,

দেখিলাম দেহ তার বিমর্ষ পাখির রঙে ভরা :

সন্ধ্যার আঁধারে ভিজে শিরীষের ডালে যেই পাখি দেয় ধরা—
বাঁকা চাঁদ থাকে যার মাথার উপর,
শিঙের মতন বাঁকা নীল চাঁদ শোনে যার স্বর।
কড়ির মতন শাদা মুখ তার,
দুইখানা হাত তার হিম
চোখে তার হিজল কাঠের রক্তিম
চিতা জ্বলে : দখিন শিয়রে মাথা শঙ্খমালা পুড়ে যায়
সে আগুনে হায়।
চোখে তার
যেন শত শতাব্দীর নীল অন্ধকার।
স্তন তার
করুণ শঙ্কের মতো—দুধে আর্দ্র-কবেকার শঙ্খিনীমালার।
এ পৃথিবী একবার পায় তারে, পায় নাকো আর।

মনে হচ্ছে খুব দামি সুরা পান করে তারার আলোয় পথ চিনে চিনে বিংশ শতাব্দীর এক গালীব ঘরে ফিরছে। মন বলছে, হাত তুমি কিসের স্পর্শ পেলে ? মন তুমি কিসের ছোঁয়া পেলে। বড় নেশাতে পড়েছি শ্যামের বাঁশীতে। পথের মোড় থেকে আমাকে পিকআপ করে নিল আমার কুকুর। নাম যার লালু এ-পাড়ার নাইট গার্ড। সকালে আমার সঙ্গে ব্রেকফাস্ট করে, লেড়ো বিস্কুট আর চা।

যা ভেবেছি, তাই, বউদি দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। উৎকণ্ঠায় মুখ থমথমে। সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই সপাটে এক চড়, 'আর কত ভাবাবে আমাকে দামড়া ! কটা বেজেছে ? ঘড়িটা একবার দেখেছ ! কোন চুলোয় আড্ডা মারতে গিয়েছিলে ?'

বউদি ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল, 'এই অন্ধকার রাত। দিনকাল কি খারাপ। থেকে থেকে লোডশেডিং। নটা বাজল, দশটা বাজল, বাবুর পাত্তা নেই।' বউদি খপ করে আমার জামার বুকটা খাবলে ধরল, 'বল, বল, কেন তুমি আমাকে রোজ রোজ এত ভাবাও ?'

বউদি আমার চেয়ে বয়সে এক আধ বছর ছোটই হবে। না কি সমান সমান। খুব কম বয়সেই দাদার সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল। এক বছরের ব্যবধানে পিউ আর বুল। দাদার বোধোদয়। ছোটো পরিবার সুখী পরিবার। বউদি সম্মানে বড়। আমার মায়ের হাতে তৈরি। মা চলে যাওয়ার পর সংসার মাথায়

করে রেখেছে। করবী ফুলের মতো মিষ্টি একটা মেয়ে। তাই হয় তো ছেলেবেলায় কেউ নাম রেখেছিল করবী।

বউদির হাতটা ধরে আমার বুকের কাছে এনে বললুম, 'বিশ্বাস করো, আজ আমি খুব ঝামেলায় পড়ে গিয়েছিলুম। আর আমি তো হাতঘড়ি ব্যবহার করি না, তাই রাত বুঝতে পারিনি।'

আমাদের দালানের ষাট পাওয়ারের আলোটাই মিটমিট করে জ্বলছে কেবল। ভোল্টেজ কম। সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে। হাসপাতালে যেমন ওষুধের গন্ধ ছাড়ে, সেইরকম একটা গন্ধ পাচ্ছি। দাদা তো রাত জাগা পার্টি, আজ সাত তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়েছে! একটু অন্যরকম লাগছে আজ।

'একটা ওষুধ ওষুধ গন্ধ নাকে আসছে বউদি?'

'তোমার দাদা অ্যাকসিডেন্ট করে বাড়ি ফিরেছে।'

'সে কি?'

রান্নাঘরের সামনে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লুম। দাদা কেন, আমি ছাড়া অন্যের কিছু হলেই আমার হাত পা ঠাণ্ডা হয়ে আসে। যা হওয়ার আমার হোক। চালচুলোহীন বাউণ্ডুলে মানুষ আমি। পড়ে থাকি মরে যাই কারোর কিছু যায় আসে না। দেবীর মতো বউদি, তাই আমার মতো অকর্মা এই বাড়িতে স্থান পেয়েছে। পাড়া প্রতিবেশীর দেখছি তো, বিয়ের পর ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই।

'কি অ্যাকসিডেন্ট হল বউদি?'

'অটো। অটোয় চেপে আসছিল, পাশ থেকে মেরে দিয়েছে।'

'খুব লেগেছে?'

'বেশ কেটেকুটে গেছে। ছালচামড়া গুটিয়ে পাকিয়ে গেছে।'

'ডাক্তার?'

'নিজেই সব করিয়ে এসেছে।'

'ছি, ছি, আজই আমার দেরি হল! একবার দেখে আসব বউদি!'

'এখন তো খুব ঘুমোচ্ছে, ঘুমের ওষুধ খেয়ে।'

'কি হবে বউদি?'

'অল্পের ওপর দিয়ে গেছে। ভাগ্যিস একটু ভেতর দিকে ছিল। আর একটু বাইরে থাকলেই হাসপাতাল।'

'আজ আর কিছু নাই বা খেলুম বউদি।'

'পাগলামি কোরো না। চলো দু'জনে যা হয় কিছু খেয়ে নিয়ে আজকের মতো দিন শেষ করি।'

কেন জানি না দাদার জন্যে মনটা কেমন করে উঠল। একা একটা মানুষ কি কাণ্ড করে বেড়ায়। যা কিছু স্বপ্ন ছিল, সব জীবনের ঘোলা জলের আবর্তে ফেলে দিয়ে মোটা দাগের বেঁচে থাকার হাতিয়ার ঘোরাচ্ছে। যখন পথ দিয়ে হেঁটে যায় মনে হয় নিঃসীম প্রান্তরের একটা গাছ তার কোনো দূর আত্মীয়কে খুঁজতে বেরিয়েছে। চোখে জল এসে গেল। আমি যখন তখন কাঁদি। আমার লজ্জা করে না। বরং মনে হয়, আমি সাহারা হয়ে যাইনি। আমার অনুভূতি জলভরা মেঘের মতো আজও ভেসে আছে।

বউদি আমার পিঠে হাত রেখে বললে, 'কি ছেলেমানুষ! তেমন সাংঘাতিক কিছু হয়নি। হতে পারত।' বউদি ভীষণ পরিষ্কার। বাথরুমে ঢুকে ঘাবড়ে যাই। যেন সায়েববাড়ির বাথরুম। কিভাবে কি করব ভেবে পাই না। শুনেছি বিলেতের বাথরুমে কার্পেট পাতা থাকে। তাকে একটা শিশিতে ঝুলকালো তেল। এটা পিউয়ের ফর্মুলা। মাখলে চুল নাকি বিজ্ঞাপনের মেয়েদের মতো হয়ে যাবে। দেয়ালের গায়ে স্ট্যান্ডে বুলের লাল ছোট্ট টুথব্রাশ। আর একটা শিশিতে রিঠা ফোটানো জল। বউদির ফর্মুলা। শ্যাম্পুর ভয়ঙ্কর দাম। বউদির সেই হাতকাটা ব্লাউজটা দরজার পেছনে ভিজে অবস্থায় ঝুলছে। চমৎকার মেরুন রঙ। উমা যদি এইরকম একটা ব্লাউজ পরে আমার সামনে এসে দাঁড়ায়! মনটা টলে গেল। ছি ছি, এ আমি কি ভাবছি। যৌবনের ভয়ঙ্কর দিন সব পেরিয়ে এসে, বিদায়ী আলোয় এ কি কুৎসিত ভাবনা!

বিশ্রী চিন্তার গলা ধাক্কা খেয়ে বাথরুম থেকে ছিটকে বেরিয়ে এলুম।

আমাদের খাওয়ার টেবিল-ফেবিল কিছু নেই। লাল মেঝেতে থেবড়ে বসে খাওয়া। বউদি কখন যে সময় পায়! সুন্দর সুন্দর আসন তৈরি করেছে। সব এক জায়গায় হাতের কাছে এনে জাঁকিয়ে বসল। যত রাত বাড়ে বউদিকে ততই সুন্দর দেখায়। মহিমদার দেওয়া গুলাব জামুনের কৌটোটা তাকের ওপর। ছেলে, মেয়ে, দাদা উঠলে কাল সকালে খোলা হবে। আজ মনে হয় অমাবস্যা। দূরের প্রাচীন কালীবাড়িতে পুজোর ঘণ্টা বাজছে। রাত ক্রমশই রহস্যময় হয়ে উঠছে।

আমরা আস্তে আস্তে কথা বলছি। সাবধানে থালা, গেলাস টানছি। সবাই ঘুমোচ্ছে।

বউদি বললে, 'আজকের মেনু হল কচুর দম আর রুটি।'

'ওয়াণ্ডারফুল। কচুর মতো সুস্বাদু আর উপকারী কিছু নেই।'

বউদি হেসে বললে, 'তুমি পারো বটে। তোমার এই গুণের জন্যে সব

মেয়েই তোমাকে ভালবাসবে।'

'বউদি বাসবে ?'

'বউদি কি মেয়ে নয় ?'

'মাইরি বলছি, কচু ভীষণ উপকারী। হোমিওপ্যাথিতে কচু দিয়ে একটা ওষুধ আছে অরাম।'

'তোমার গালে লেগেছে ? চড়টা খুব জোরে হয়ে গেছে।'

'ধ্যুর তোমার চড়ে যে স্নেহ, তার কি কোনো তুলনা আছে বউদি ? তুমি ওসব বুঝবে না।'

'বিশ্বাস করো, তোমাকে আমি ভীষণ ভীষণ ভালবাসি, তুমি যতক্ষণ বাড়ি না থাক আমার ভীষণ ফাঁকা লাগে।'

বউদির রান্নার হাত অসাধারণ। সামান্যকেও অসামান্য করে তুলতে পারে। এইরকম রান্না না হলে আমাদের উপোস করে মরতে হত। কচুকে আর কচু বলেই মনে হচ্ছে না। আটায় ছাতু মিশিয়ে সুস্বাদু রুটি। বউদির আবার কাঁচালঙ্কা প্রীতি ভয়ঙ্কর। রাত্-বিরেত মানে না। কচাকচ গোটা তিনেক মেরে দেবে। বললেই বলবে, গরিবের বৈতরণী কাঁচালঙ্কা।

বউদি একটু লাজুক লাজুক মুখ করে বললে, 'কই বললে না তো ?'

'কি বল তো ?'

'কেমন ব্লাউজ পরেছি ? হাতাটা দেখ। সেই পুরনো আমলের মতো।'

'ও মা, তাই তো।'

'সকালে তোমার খারাপ লেগেছিল ?'

'না, না, আমার নয়। বুলটার ভীষণ নজর। আমাকে বলে কি, টুম্পার মা কিরকম জামা পরে জান, সব দেখা যায়। টুম্পা বলে হাই ভোল্টেজ জামা। কারেন্ট মারে। একালের বাচ্চারা ভীষণ ইন্টেলিজেন্ট বউদি। আমাদের কালের মতো বোকাহাবা নয়। অল্প বয়সেই তাদের চোখ ফোটে। ভীষণ তাদের কৌতূহল। বড়দের জগতটাকে খুটিয়ে খুটিয়ে দেখে। মোটামুটি বোঝেও সব।'

আমার একটা ছোট্ট ঘুপচি মতো ঘর আছে। মালপত্র বিশেষ কিছুই নেই। দেয়ালেই একটা আলনামতো। গোটা কতক জামাকাপড় ঝুলে থাকে। একটা চৌকি একপাশে। নীচে একটা প্যাঁটরা, আর একটা সফ্‌ট ব্যাগ। প্রায়ই বাইরে যেতে হয়। দেয়ালে মা আর বাবার ছোট্ট এক জোড়া ছবি। মিটে গেল ঝামেলা। দেব-দেবী, পাঁজি-পুঁথি আমি মানি না। যাদের অনেক আছে,

হারাবার ভয়ে তাঁরা মানেন। ঈশ্বর যাঁকে রিক্ত করে পাঠিয়েছেন, তার আবার ভয়টা কিসের। ল্যাংটার নেই বাটপাড়ের ভয়। চারপাশের চারটে হুকে মশারিটা টাঙাবো, ধপাস করে শুয়ে পড়ব। একটা টেবিলফ্যান আছে, স্টিমারের প্রপেলারের মতো তার হাঁক ডাক। খাজনার চেয়ে বাজনা বেশি। আজ আর চালাবো না দাদার ঘুম ভেঙে যাবে। খুব কমই চালাই। ইলেকট্রিকের বিল বেড়ে যাবার ভয়ে। আমার ঘুমের খুব ঘনঘটা। গরম আমাকে কাবু করতে পারে না। বিছানায় পড়া মাত্রই মড়া।

বাইরে ঝোড়ো বাতাস বইছে। সারা বাড়ি নিস্তব্ধ। পাশের ঘরেই দাদা, বউদি। খুব মৃদু কথার শব্দ আসছে। একটা গাছের ডাল জানলা ছুঁয়ে চলে যাচ্ছে, তারই খসখস শব্দ। আজ আর বালিশে মাথা রাখা মাত্রই ঘুম আসছে না। যে হাত উমার হাত ছুঁয়েছিল, সেই হাতে আবার ফিরে এসেছে গোল নরম একটি হাত। বিদ্যুতের মতো আঙুল। অদ্ভুত সেই হাসি আর চোখের ভঙ্গি। সারা শরীর যেন ঝিম ঝিম সেতার। ভীষণ ঘুমের বদলে ভীষণ সুখ পেয়েছে আমার। জেগে জেগে স্বপ্ন দেখছি। মহিমদার ব্যবসা, সম্পত্তির মালিক হয়েছি আমি। গরদের পাঞ্জাবি, ফিনফিনে ধুতি, আঙুলে আঙুলে জ্বল জ্বলে আংটি। ওই শক্ত পোক্ত ঝকঝকে কালো গাড়িটা আমার। এখানে যাচ্ছি, ওখানে যাচ্ছি নিজের ইচ্ছে মতো। সুন্দর বাগানঘেরা একটা বাড়ি। নরম নরম বিছানা। পালিশ করা মেঝে। বিলিতি বাথরুম। ওপর থেকে বৃষ্টির ধারার মতো জল পড়বে। অবিশ্রান্ত। দামি সাবানের খুশবু। চান করার পর বড়লোকরা যেমন নরম একটা আলখাল্লা পরে কোমরে বেল্ট বাঁধতে বাঁধতে বেরিয়ে আসে, সেইরকম আমিও বেরিয়ে এসে সুন্দর একটা ড্রেসিং টেবিলে বসব। সেখানে হাত আয়না আর দাড়া ভাঙা চিরুনি নয়, থাকবে সোনালি ফ্রেমে ঘেরা গোল আয়না, সাত রকমের চিরুনি আর বুরুশ। সাতরকমের পারফিউম। তার মধ্যে একটার নাম পয়েজন। শিশির রঙ নীল বিষের মতো। নিউমার্কেটে একবার দেখেছিলুম, আড়াই হাজার টাকা দাম। সাত সাগরের তীরে আমার স্বপ্নে দেখা রাজকন্যা থাকে। বাটি সাবানে আর দাড়ি কামানো নয়, গালে ফোম মেরে স্যান্ডউইচ ব্লেড দিয়ে মাখমের মতো নামাবো। থাবড়ে থাবড়ে আফ্‌টার শেভ লোশান। পায়ে ভেলভেটের চটি। উমা শাড়ি পরে শোবে না লেসের নাইটি। বউদি সবসময় সিল্কের শাড়ি পরবে। তিনটে কাজের লোক চরকিপাক খাবে। দাদার ঠোঁটে বিলিতি সিগারেট। বুলকে পাঠাবো দুন স্কুলে, পিউকে রাজস্থান। টি ভি, ভি সি আর, ওয়াশিং মেশিন, ভ্যাকুয়াম ক্লিনার,

স্টিরিও সাউন্ড সিস্টেম। বড়লোক, আরো বড়লোক, আকাশে মাথা ঠেকে যাচ্ছে। সুখ, আরো সুখ, সুখ সাগরে, শুক-শারী। বউদির হাতে সব কিছুর চার্জ। সর্বময় কর্ত্রী। উমা আর মহেশ্বর-আমি নেচে নেচে বেড়াবো। হাতে আর জর্দার কৌটোর ঝোলা নয়, থাকবে স্কাই ব্যাগ। প্লেনে চাপবো। রেল হলে, এসি ফার্স্ট ক্লাস। ঠ্যাং করে একটা বাজল প্রতিবেশীর দেয়াল ঘড়িতে। সেই শব্দে আমার বাস্তবে পতন হল। পিউয়ের একটা বই ছিল নার্সারি রাইমস। সেই ছড়াটা মনে পড়ে গেল। বোধ হয় আমার এই স্বপ্ন নিয়েই লেখা Moses supposes his toeses are roses. But Moses supposes erroneously ; For nobody's toeses are posies of roses As Moses supposes his toeses to be.

স্বপ্নের ফানুস নীল আকাশে ভেসে গেল। আমার রবীন্দ্রনাথই ভাল, চারিদিক হতে বাঁশি শোনা যায় সুখে আছে যারা তারা গান গায়। আর আমার, 'না-বলা বাণীর নিয়ে আকুলতা আমা বাঁশিটি বাজানো।' আবার ঠ্যাং। কার ঘড়ি লেটে চলেছে ! ঘুমোই বাবা !

॥ চার ॥

পাখি উড়তে পারে। মানুষও পারে। মনের ডানায় ভর করে। হঠাৎ কোথা থেকে খুশির হাওয়া এল। খুশির হাওয়া লাগল পালে। কেন ? হঠাৎ পৃথিবীটাকে এত সুন্দর লাগছে কেন ? ন্যাকা ! কেন লাগছে জান না ! প্রেমে পড়েছ প্রসাদ। দেখ কি হয় !

একবার নয়, দু'বার ব্লেড চালালুম গালে। মুখটা বেশ উজ্জ্বল লাগছে। যৌবন যেন যেতে গিয়ে থমকে দাঁড়িয়েছে। আরো একটু বোসো। পৃথিবীর কঠিন দিকটা দেখেছি। মৃত্যু, দারিদ্র্য, বঞ্চনা, শয়তানি, শত্রুতা। এইবার নরম দিকটা একটু দেখতে দাও জীবন। শোনো, মানুষের বিশ্বাসে আঘাত দিয়ো না। জীবনের প্রথম দিকটা যারা কষ্টে কাটায়, শেষের দিকে তাদের সুখ হয়। বেশি না হলেও অল্প হয়।

পিউ পেছন দিক থেকে এসে, পিঠের ওপর দিয়ে ঝুঁকে পড়ে বললে, 'কাকু তুমি ক'দিন দেখছি কেবল গুনগুন করে গান গাইছ, সেদিন দেখলুম চালতা তলায় ভরতনাট্যম প্র্যাকটিস করছ, তোমার ব্যাপারটা কি ? মনে হচ্ছে খুব

আনন্দে আছ !'

'কেন থাকবো না বল ! তোর মতো মেয়ের যে কাকা, তোর মায়ের মতো মা যার বউদি, সে কেন দুঃখে থাকবে ! হেসে নাও, দু'দিন বই তো নয়। আজ এত সেজেছিস !'

'একে তুমি সাজ বলছ ! এই ফ্রকটা মা করে দিয়েছে। একে কি বলে জানো, অ্যাপ্লিক। যেখানে যত টুকরো কাপড় ছিল, সব জুড়ে জুড়ে এটা তৈরি।'

'তোর মা একটা জিনিয়াস ! তোর রূপ যেন আরো খুলে গেছে। কেন আমার আনন্দ হবে না বল !'

'আজ তো দুধ ছাড়া চা খেয়েছ ?'

'তাতে কি হয়েছে ! ইন্টেলেকচুয়াল বড়লোকরা খায়।'

'দুধ এসেছে,এক কাপ ভাল চা চলবে না কি।'

পেছন দিক থেকে আমার কাঁধে দাড়ি রেখে পিউ কথা বলছে। দাড়ি কামাবার আয়নায় আমার মুখের ছায়ায় তার মুখ ভাসছে। কপালে ছোট্ট টিপ। কেলেঙ্কারি রকমের সুন্দরী হয়ে উঠছে পিউ। ভয় লাগছে। সুন্দরী মেয়েরা সংসার জীবনে সুখী হয় না। কি করা যায় ! ভবিষ্যতকে কেমন করে মোচড় দিয়ে নিজের অধিকারে আনা যায় ! যা চাইব তাই হবে।

পিউ বললে, 'তোমাকে আজ খুব সুন্দর দেখাচ্ছে। দেখেছ, তোমার মুখের সঙ্গে আমার মুখের বেশ মিল আছে।'

'তা তো থাকবেই। তুই তো দাদার মেয়ে। দাদার মুখের সঙ্গে আমার মুখের মিল আছে না ! শোন পিউ, চল আমরা সবাই মিলে পুজোর পর রাজস্থান বেড়িয়ে আসি। যাবি ? খুব মজা হবে। রাজস্থান টেরিফিক জায়গা। ইতিহাস। সবটাই ইতিহাস। মোড়ে মোড়ে, ঘরে ঘরে, দেয়ালে দেয়ালে ইতিহাস।'

'কেন লোভ দেখাচ্ছ কাকু !'

'কেন লোভ কেন ? আমরা যেতে পারি না ? জয়সলমিরে আমরা উটের পিঠে চেপে মরুভূমি দেখতে যাবো। আলোয়ারে তোকে রাজস্থানী গয়না কিনে দেবো। যোধপুরে রাজস্থানী ঘাঘরা।'

'অত টাকা তুমি কোথা থেকে পাবে কাকু। রেলের ভাড়া বেড়ে গেছে, জানো কি তা ?'

'রোজগার করব। ইনকাম। এই ক'মাসে জর্দা যা বিক্রি হবে না !'

বউদি এল ঘরে। আজ মা, মেয়ের কি হয়েছে? বউদির শাড়িটা চোখ ঠিকরে দিচ্ছে। ভিজে চুল পিঠের ওপর খোলা। পিউ আমার পেছন থেকে সরে জানালার কাছে চলে গেল।

'আজ কি গো বউদি? তোমরা এত সেজেছ?'

'এটা জোড়া শাড়ি ঠাকুরপো।'

'সে আবার কি?'

দু'টো টুকরো, মাঝখানে লম্বা সেলাই। সেই জন্যে যা দাম হওয়া উচিত তার হাফ দাম।'

'সেলাই বোঝা যাবে?'

'কায়দা করে পরতে হয়, যাতে সেলাইটা চলে যায় ভাঁজের মধ্যে। এমনি প্লেন পরলে হবে না, কুঁচি দিয়ে পরতে হবে। এই তো পরেছি। বুঝতে পারছ!' বউদি মডেলের মতো গোল হয়ে ঘুরে গেল।

মেয়েদের প্রশংসা করলে, কেনাকাটায় জিতেছে বললে ভয়ঙ্কর খুশি হয়। সামান্য একটা কথা। লাখ, দু'লাখ টাকা নয়। দুঃখের সংসার থেকে আনন্দ সাগরে।

আমি বললুম, 'বউদি, কি ফ্যান্টাস্টিক দেখাচ্ছে তোমাকে। মনে হচ্ছে, আজ কোনো উৎসব। কত দাম বউদি?'

'বল তো কত হতে পারে?'

মেয়েদের নিয়ে এই এক সমস্যা! দাম নিয়ে পরীক্ষা। হেরে গিয়ে আনন্দ দোবো বলে, বাড়িয়ে বললুম, 'দেড়শো টাকা।'

উমার যেমন মুখ ছাওয়া উদ্ভাসিত হাসি, বউদির সেইরকম ঝাপ্টা হাসি। যেন চমকে উঠে কার্নিস থেকে এক ঝাঁক পায়রা ফটফট উড়ে গেল। হেসে বললে, 'দেড়শো টাকার শাড়ি পরে ঘরে ঘুরবো! তোমার মাথা খারাপ! তাহলে তো আমি পার্কে বসে ফুচকা খাবো।'

'তা হলে কত দাম?'

'চেষ্টা করো! তুমি তো বাজারে ঘোরো। কত কি দেখ! কত জায়গায় যাও।'

'শাড়ির জগতের কোনো জ্ঞানই আমার নেই। আমি তামাকের লাইনের।'

'যা বললে তার অর্ধেকেরও কম। আরো দশ কম।'

'তার মানে সত্তর।'

'কি পাকা মাথা তোমার অঙ্কে! পঁয়ষট্টি।'

'বলো কি? কোথায় পাওয়া যায়!'

'কিনবে না কি? কার জন্যে?'

'তুমি ছাড়া আমার আর কে আছে!'

উমার কথাই মনে পড়েছিল। হাল্কা রঙের জমির ওপর এমন একটা হাল্কা কাজের শাড়ি উমাকে বেশ মানাবে। পাতলা শাড়িতে শরীরের গড়ন আরো স্পষ্ট হবে। একটু ভাল সেন্ট স্প্রে করে দোবো। চুল সিল্কের মতো করে দেয় যে শ্যাম্পু, সেই শ্যাম্পু করা চুলে এলো খোঁপা। উমাকে নিয়ে চলে যাব কুলুমানালি। ছোট্ট একটা কটেজ, ভেতরে ফায়ারপ্লেসে ভদ্র আগুন, ফুরফুরে শিখা, কাঠের চিড়চিড় শব্দ, যেন শায়েরি বলছে, বাইরে থান থান বরফ, ভরা চাঁদের আলোয় পরীর মতো নীল। পাহাড় থেকে বয়ে আসা বাতাস সুখ সুখ হিম। লেসের পর্দায় চাঁদের আলোর জমি, সূক্ষ্ম সুতোর কাজে ফুল লতাপাতা, ভালবাসার মতো গভীর। ওয়ালনাটের টেবিলে ঘষা পেতলের কফিদান, বেতের বাস্কেটে কুলু যুবতীর গালের মতো লাল আপেল। জাফরানের গন্ধ মোড়া বাতাসী চালের বিরিয়ানি, স্তনবৃন্তের মতো টোসাটোসা কিসমিস, পায়ের তলায় সুখের কার্পেট। 'কল্পনার হাঁস সব পৃথিবীর সব ধ্বনি সব রঙ মুছে গেলে পর। উড়ুক উড়ুক তারা হৃদয়ের শব্দহীন জ্যোৎস্নার ভিতর ॥'

'কি বলছি শুনতে পেলে? কোন ভাবের রাজ্যে আছ তুমি?'

চমকে তাকালুম বউদির দিকে। কেমন যেন অচেনা মনে হচ্ছে। অন্যরকম দেখাচ্ছে।

'কি বলছিলে তুমি?'

'শুনতে পাওনি?'

'আমি একটা অন্য কথা ভাবছিলুম।'

'কি কথা শুনি? একেবারে বাহ্যজ্ঞান হারিয়ে?'

আমার আবার কবিতা এসে গেল। নিজেতো লিখতে পারলুম না কিছু, তাই মাঝে মাঝে নিজেই জীবানন্দ দাশ হয়ে যাই। বউদির দিকে তাকিয়ে বললুম:

'তোমার মুখের দিকে তাকালে এখনো
আমি সেই পৃথিবীর সমুদ্রের নীল,
দুপুরের শূন্য সব বন্দরের ব্যথা,
বিকেলের উপকণ্ঠে সাগরের চিল,
নক্ষত্র, রাত্রির জল, যুবাদের ক্রন্দন সব
শ্যামলী, করেছি অনুভব।'

বউদি আমাকে অবাক করে বলতে লাগল :

'অনেক অপরিমেয় যুগ কেটে গেল ;

মানুষকে স্থির-স্থিরতর হতে দেবে না সময়',

'বউদি, ইউ আর গ্রেট', বলে আলিঙ্গন করতে যাচ্ছিলুম। পাজামা, পাঞ্জাবি পরা দাদা আমার উদভ্রান্তের মতো ঘরে ঢুকলো। হাতে একটা খাম। চৌকির ওপর বসে বলল,

'ফিনিশ।'

'ফিনিশ মানে ?' বউদির হাসি মিলিয়ে গেল।

'তিনশো আশি।' দাদা আমার বিছানায় শুয়ে পড়ল।

আমিও বুঝতে পারছি না। বউদির সেলাই মেশিন সারাতে গেছে। 'তিনশো আশি টাকা লাগবে ?'

'আমার ব্লাডসুগার তিনশো আশি। সেই কারণেই অ্যাকসিডেন্টের পায়ের ঘাটা কিছুতেই সারছে না। পেকে ফুলে রস বেরোচ্ছে। তাই শরীরটা দিন দিন এত শুকিয়ে যাচ্ছে। একটুতেই এত ক্লান্ত হয়ে পড়ি। হাঁপ ধরে। হয়ে গেল। ফিউচার ডুম। মেয়ের বিয়ে বাকি। ছেলের এডুকেশান। সঞ্চয় শূন্য। ভাত বন্ধ। আলু বন্ধ। ডাক্তারবাবু বললেন, স্রেফ হাই প্রোটিন, ছানা, মুরগীর মাংস, সোয়াবিন। বোঝো ঠ্যালা।'

দাদা একেবারেই ভেঙে পড়েছে। সাহস দেওয়া দরকার, 'সুগার আজকাল প্রায় সকলেরই। বড়লোক তো সুগার ছাড়া হয়ই না ; যেমন শিং ছাড়া গরু হয় না, লেজ ছাড়া বেড়াল হয় না। অত ভাবছ কেন ?'

'আরে ডাক্তারবাবু তো নিজেই ভেবে অস্থির। বললেন, থরো একটা চেকআপ করান, ইসিজি, স্ক্যানিং। হাজার হাজার টাকার ধাক্কা।'

'ডাক্তারবাবু ভাবুন, ক্ষতি নেই। তুমি অত ভেব না।'

'আরে আলুভাতে ভাত ছিল আমাদের মেন খাওয়া। আলু ছাড়া আমাদের কি আছে ?'

'এইবার পেঁপে চালাও। চিনি ছাড়া চা, তিন দিনে অভ্যাস হয়ে যাবে। মুরগীর বদলে সোয়াবিন, আর বীভৎস রকম হাঁটো। সাত মাইল, আট মাইল। অফিস থেকে ফেরার সময় হেঁটে ফেরো। মনে করবে, বাস ট্রাম বন্ধ হয়ে গেছে। দিবা বন্ধের বদলে সান্ধ্য বন্ধ হয়েছে। হেঁটে সুগারটাকে পুড়িয়ে দাও। যে-ব্যায়রামের যা আরাম। একেবারে ভাবতে ভাবতে শুয়ে পড়লে। এমন একটা করলে যেন কি না কি হয়েছে! কাণ্ডয়ার্ড। চলো, আজ তুমি

আমার সঙ্গে মার্কেটে ঘুরবে। একদিনেই তোমার সুগারমিল উঠে যাবে। অফিসে বেরোচ্ছ না কেন ? যত ঘরে বসে থাকবে তত তোমার রোগের চিন্তা বাড়বে।'

দাদা ধীরে ধীরে উঠে বসল, 'সাধে বেরোচ্ছি না রে! আমার পায়ের অবস্থাটা একবার দেখ।' ঢোলা পাজামার তলা থেকে ডান পাটা বের করে দাদা আমাকে দেখাল। আমি ঠিক এতটা জানতুম না। আমারই অপরাধ। সারাটা দিন বাইরের জগতে হই হই করি। লেগেছে, কেটেছে, ওষুধ চলছে কমে যাবে ধীরে ধীরে। এ তো ভয়ঙ্কর অবস্থা। গোটা ডান পা বিষিয়ে থোড়ের মতো হয়ে গেছে।

'তুই বল, এই অবস্থায় বেরনো যায়!'

'তোমার এতটা বাড়াবাড়ি, আমাকে একবার জানাওনি ?'

'আরে আমিই কি পাত্তা দিয়েছি। সামান্য কাটাছেঁড়া নিয়ে কেউ মাথা ঘামায়! তোর বউদিকেও কি আমি বলেছি না কি ? হঠাৎ দেখি সাংঘাতিক অবস্থা! নিজের পা দেখে নিজেই অবাক!'

পিউ ফোঁস ফোঁস করে কান্না শুরু করল। বউদি মোটেই দুর্বল চরিত্রের মেয়ে নয়। তার চোখও ছলছলে। একটা অটো, একটা ধাক্কা, একটু ক্ষত। একটা রাত কেমন চিরস্থায়ী হতে চলেছে। নিয়তির কি পাওয়ার! এই সামান্য এক টুস্কিতে সংসার আবার কোন দিকে মোড় নেয় দেখো। ডাক্তারদের সঙ্গে মিশে মিশে, হরেক রোগীর সেবা করে সামান্য যা জ্ঞান, তাতে মনে হচ্ছে, দাদার সেলুলাইটিস হয়ে গেছে। হেলাফেলার ব্যাপার নয়।

'পাড়ার ডাক্তারে হবে না দাদা। চলো স্পেসালিস্টের কাছে নিয়ে যাই। আমার পরিচিত একজন আছেন। অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছাড়াই হবে। চলো আজই যাই। নো ডিলে।'

'আরে মাসের শেষ।'

'তোমার মাসের শেষ, আমার তো শেষ নয়। আমি তো একটা গুণ্ডার মতো, একটা মাস্তানের মতো স্টিল গোয়িং স্ট্রং। চলো আজই যাবো।'

'শোন, সুগারের ওষুধটা পড়ুক, দু'দিন দেখি, তারপর না হয় যাওয়া যাবে। ভিড় বাসে আমার উঠতে সাহস হচ্ছে না।'

'তোমার কি মাথা খারাপ। এই পায়ে তোমাকে বাসে তুলবো ? টানা ট্যাকসি।'

বউদি বললে, 'আর একদিনও দেরি নয়। আজ পিউয়ের জন্মদিনের জন্যে

যে-টাকাটা জমিয়েছিলুম তাতে দু'পিঠের ট্যাকসি ভাড়া হয়ে যাবে।'

ও আজ পিউয়ের জন্মদিন! 'শোনো বউদি, জন্মদিনও হবে, দাদাকে দেখানোও হবে। কোনোটাই বাদ যাবে না। জন্মদিন বছরে একবারই হয়।'

পিউ কাঁদো কাঁদো গলায় বললে, 'না কাকু, পায়েস হবে, বাবা খেতে পাবে না।'

'বাবার জন্যে ছানার কালিয়া হবে। খাওয়ার জিনিসের অভাব আছে! তোরা এমন ভেঙে পড়লে চলে!

আয় না, আমরা সবাই মিলে ফাইট করি।'

বুল মর্নিং স্কুল থেকে ফিরে ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বললে, 'টেরিফিক ফাইট করে এলুম মা। অ্যায়সা একটা ঝেড়েছি খোকনকে। বাপ তুলেছিল মা।'

বুলের সাদা জামার বুকপকেট ছিঁড়ে ঝুলছে। বউদি বললে, 'তোকে আমি গুণ্ডা হওয়ার জন্যে স্কুলে পাঠাই? জামার পকেটটা ছিঁড়লি কি করে?'

'বাই চান্স ছিঁড়ে গেল মা। দিদি সেলাই করে দে।'

বুল যেন যুবরাজ! হুকুম ছাড়া কথা বলে না। জামাটা খোলার জন্যে টানাটানি করছে।

বউদি বললে, 'তুই মারামারি করলি কেন? গায়ে খুব জোর হয়েছে?

'আমি ভীম পহেলবান। কাকু তুমি আমাকে কবে কাশী নিয়ে যাবে! নন্তুটাকে আচ্ছা করে পেটাতে হবে। খুব বেড়েছে।'

নিজের প্যাঁচেই নিজে মরেছি। বুলকে এখন সামলাতে হবে। দাদা জীবনে কারোর ওপর রাগতে পারেনি। এক ধরনের মানুষ থাকে যারা চির বন্ধুর মতো। সকলের বন্ধু, মানুষ, জীব-জন্তু, কীট-পতঙ্গ। দখিনা বাতাস কখনো কালবৈশাখী হতে পারে না। দাদা আমার সেইরকম। ভোমলা হয়ে বসে আছে। পিউয়ের চোখে জল, বউদি ছলছলে, বুল ডাকাত। দাদা দেখছে।

বুলকে বললুম, 'শোন্, ভীম পহেলবান স্কুলে কখনো কারোর সঙ্গে মারামারি করেনি। কেন বল তো? পরে বড় হয়ে বড় বড় লড়াই করবে বলে। স্কুলে গিয়ে বন্ধুদের সঙ্গে কখনো মারামারি করবে না। তাহলে ভীম পহেলবান তোমাকে কোনোদিন চেলা করবে না।'

'কি করে জানতে পারবে কাকু?'

'ভীম পহেলবান সব জানতে পারে।'

বুল মুখ নিচু করে ভাবল কিছুক্ষণ। সেই অবসরে আমি আরো এক দাগ চড়িয়ে দিলুম।

'যারা সত্যি সত্যি পালোয়ান হয়, তারা কখনো রাগ করে না, মারামারি করে না; তারা শুধু ভালবাসে।'

'শুধু ভালবাসে?'

'হ্যাঁ, সবসময় ঠাণ্ডা মাথা, মুখে হাসি, আর ভাই বলে কথা। তা না হলে বড় হওয়া যায়!

বড় হওয়া কি অতই সোজা। সকলকে ভালবাসলে তবেই সকলে তোমাকে ভালবাসবে, তবেই তুমি বড় হতে পারবে।'

'বড় হওয়া কাকে বলে কাকু, লম্বা হওয়া?'

ঘরের দেয়ালে রবীন্দ্রনাথের ছবি। বুলকে দেখিয়ে বললুম, 'চেনো।'

'কে না চেনে? রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।'

'এই যে একটা কথা বললি, কে না চেনে, সবাই যাঁকে চেনে, যাঁর ছবি দেয়ালে দেয়ালে ঝোলে, তিনিই বড়। তাকেই বলে বড় হওয়া। অতটা না হতে পারলেও, তাঁর মতো একটুও হতে পারলে তুমি কিছুটা বড় হলে। তোমার বাবার দিকে তাকাও, তোমার মাকে দেখ। কত ভাল! তুমি তাঁদের ছেলে। মনে থাকবে?'

'আর আমার কাকু! কাকুর দিকে তাকাবো না?'

'ধ্যুর বোকা, নিজের মুখে সে-কথা বলি কি করে? তাকানো তো উচিত। আমি তো তোর বেস্ট ফ্রেন্ড। হাত মেলাও হিরো।'

বুল তড়াং করে এক লাফ মেরে আমার গলা ধরে ঝুলে পড়ল। বউদি বললে, 'ওরে, লেগে যাবে।'

বুল বললে, 'আমরা ভীম পহেলবানের চেলা। আমাদের লাগে না মা।'

বেঁচে থাকার নেশা বা ঘোর এত প্রবল ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই সংসার আবার সুরে ফিরে এল। গনগনে রোদে আমি রাস্তায়। অর্থমন্ত্রীর বাজেট বক্তৃতার মতো বউদি মিনিট পনেরোর একটা ভাষণ দিয়েছে, শোনো পিউয়ের জন্মদিনে তোমাকে কিছুই দিতে হবে না। দিনকাল খুব খারাপ, পয়সা একদম বাজে খরচ করবে না। ওর সব আছে।

কি আছে আমি জানি। ভীষণ ভাল একটা মন আছে। তা না হলে সাততালি একটা জামা পরে কেউ আনন্দে লাফায়! অন্য কোনো মেয়ে হলে ঠোঁট ফুলে যেত। এ-সব বউদির ট্রেনিং। অল্পে সন্তুষ্ট হওয়ার শিক্ষা। পয়সা, পয়সা! সঞ্চয়ের কি মূল্য আছে! আজ যা দশ টাকা কালই তা পাঁচ টাকা। দেবীর মতো একটা মেয়ে, তার মুখের হাসির মূল্য লাখ টাকা। সারা দিন

খুটখুট করে কত কাজ করে ! কুয়োতলায় রোদে বসে যখন নরম নরম হাতে থুবে থুবে কাপড় জামা কাচে আমার খুব কষ্ট হয়। ফুল ফুল ফ্যানা ভেসে যাচ্ছে, নীল নীল কাঁচের চুড়ি রিনরিন বাজছে, চালতার ডালে অবাক শালিক, রোদের কোনো মায়া নেই, চালতার পাতা আপ্রাণ চেষ্টা করছে ছায়াটাকে পিউয়ের দিকে একটু ঠেলে দিতে, বড়ই সূর্যাধীন। মধ্যগগনে দীপ্র মার্তণ্ড, পিউ জ্বলছে ফসফরাসের মতো। উদাস দুপুরে স্বপ্নভরা চোখে পিউ তাকিয়ে থাকে সাদা বাড়ির অ্যান্টেনার দিকে, কালো পাখি দোল খায়, বেলা চলে যায়, দিন থেকে দিন ঝরে যায়। আমরা সবাই জীবনের জুয়া খেলায় দিনের নোট হারাই।

'আরে প্রসাদ যে !' পেছনে পরিচিত কণ্ঠ। সর্বনাশ ! টাইম ইজ টু শর্ট-এর পাল্লায় পড়ে গেলুম। বিপ্লববাবু। 'ভুলে গেছ ! তোমাকে বললুম মেয়েটার জন্যে একটা পাত্র জোগাড় করে দাও, টাইম ইজ টু শর্ট।'

'জ্যাঠামশাই ভুলিনি আমি। বাঘের মতো ওঁত পেতে আছি। পেলেই জাম্প।'

থার্টি ক্রশ করে গেল, তোমাদের কারোর একটু দয়ামায়া নেই। বলছে ভুসভুস করে চুল উঠছে। এরপর কেউ বিয়ে করবে ! একশো টাকা, এতটুকু একটা শিশি। মাখলে চুল ওঠা বন্ধ হয়। পেনসানের টাকা ভেঙে তাই এনে দিলুম। কত আর আনব। টাইম ইজ টু শর্ট। যা হয় একটা কিছু কর। একটা ছেলে হব হব হয়েছিল। এমন বরাত জেলে চলে গেল। শোনো, খেতে পরতে পারলেই হবে। টাইম ইজ টু শর্ট। এটা একটা ডিসগ্রেস, নিজে সেই কবে বিয়ে করে ফেললুম, আর বিয়ের ফলটির বিয়ে দিতে পারলুম না। আজকাল কি প্রেম ছাড়া বিয়ে একেবারেই হচ্ছে না !'

'কেন হবে না। হচ্ছে তো।'

'আচ্ছা তুমি এইরকম ধর্মের ষাঁড় হয়ে আর কত কাল ঘুরবে ? টাইম ইজ টু শর্ট।'

'আমার যে অনেক দায়-দায়িত্ব জ্যাঠামশাই। নো রোজগার।'

'কি কর তোমরা ? নিজেদের কেরিয়ারটা একটু গোছাতে পার না, তা হলে মেয়েগুলোর একটু হিল্লে হয়। আচ্ছা, তোমাকে আমি পাত্র খুঁজতে বলেছি কি না ?'

আজ্ঞে হ্যাঁ বলেছেন।'

'এই কথাটাই তুমি দয়া করে তোমার জ্যাঠাইমাকে বলে যাও।'

'ঠিক আছে, আমি সময় মতো বলে আসব।'

'না না, তোমার সময় অজগরের সময়। টাইম ইজ টু শর্ট। তুমি এখনই চল। তা না হলে আজ আর আমার দুপুরে ভাত জুটবে না।'

'তা হলে একটা কাজ করুন, আপনি যান, আমি বাজার ঘুরে আসছি।'

'প্রসাদ, আমি যদি একাই ফিরতে পারব, তাহলে তোমার সাহায্য চাইব কেন ? টাইম ইজ টু শর্ট। মা আর মেয়েতে কাল রাত্তির থেকেই তোপ দাগাদাগি চলেছে। দুর্গ ভেঙে পড়ে আর কি। স্পিনস্টার বলে একটা কথা আছে ইংরেজিতে, অবিবাহিতা নারী, বয়েস পেরিয়ে যাবার পরেও যাদের বিয়ে হয় না, তারা যে কি ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে তোমার কোনো ধারণা নেই। কেবল কথার স্পিন মারছে, আর উইকেট ছেতরে যাচ্ছে। টাইম ইজ টু শর্ট। আগে আমার ওখানে চল, তারপর তোমার বাজার। তুমি একটা পরোপকারী ছেলে !'

'চলুন তা হলে।'

গলির ভেতরে ভদ্রলোকের বাড়ি। একসময় যথেষ্ট বোলবোলা ছিল। দোল দুর্গোৎসব হত। তখন এই অঞ্চল ছিল ফাঁকা। বিজ বিজ করে একতলা, দেড়তলা, আড়াইতলা, যে যা পেরেছে তুলেছে। আলো, বাতাস, গাছ, মাঠ সব গেছে। বর্তমানে এঁদো। এ তল্লাটে পুকুরও ছিল। মিউনিসিপ্যালিটির ময়লা ফেলে বুজিয়ে, প্লট করে বাড়ি উঠেছে। কোনো কোনো বাড়িতে জানলা বসাতে পারেনি চট ঝুলিয়ে দিয়েছে। এমন একটা পাড়ায় ঢুকলেই মন খিঁচড়ে যায়।

সাবেক আমলের গুল বসান বিশাল দরজা। রোদে পুড়ে পুড়ে কাঠের আঁশ বেরিয়ে পড়েছে। বাইরে থেকে বোঝার উপায় নেই, ভেতর দিকে বেশ বড়। নিচের তলায় ভাড়াটে। মেটে মেটে, আঁশটে আঁশটে গন্ধ। ভিজে ভিজে হড়হড়ে মাটি। ভাড়াটেরা ইলিশ মাছ রাঁধছে। বীভৎস গন্ধ। উঠোনের এ-পাশ থেকে ও-পাশ মোটা তার। তারে বিশাল বিশাল ফাঁদাল শায়া, নানা রঙ, বিরাটাকার বক্ষবাস, নানা ছোপ ধরা ভিজে শাড়ি। চিরুনির মতো নারীকণ্ঠ। ঢোকামাত্রই এক ভাড়াটে শিশুর ধোলাই কমপ্লিট করে, তার দশাসই মা রায় দিলেন, যেমন বাপ তার তেমন ব্যাটা। জাত শয়তান। ছেলে আমাদের ঢুঁ মেরে বাইরের দরজার দিকে ছুটে যেতে যেতে বললে, 'শয়তানী।' মা বললেন, 'তুই আজ বাড়ি আয়, 'হাড় খাবো, মাংস খাবো, চামড়া দিয়ে ডুগডুগি বাজাবো।'

শায়া ছাড়া শাড়ি। উঁচু করে ফেরতা দিয়ে পরা। গায়ে ব্লাউজ নেই। চুল চুড়ো করা। মুখে এক রাশ বিরক্তি। শরীরে জন্মনিয়ন্ত্রণ বটীকার মেদ। তিন থাক কোমর। একদা সৌন্দর্য ছিল। শয্যায় স্বামীকে উষ্ণ প্রেমের কথা শোনাতেন একদা। চুড়ির জলতরঙ্গ। সংসার টোস্ট করে ছেড়ে দিয়েছে। দোক্তাপাতা যতই ভাজা ভাজা হয় ততই তার ঝাঁঝ।

'টাইম ইজ টু শর্ট। চলো চলো, ওসব তোমাকে দেখতে হবে না। সারা দিন চলবে।'

দেয়াল ঘেঁসে সিঁড়ি দোতলায় গেছে। সিঁড়ির মাথায় একটা বস্তা দু'ভাঁজ করে পাতা। পা মোছার জন্যে। বারান্দায় একসময় কাঠের ঝিলমিল লাগানো ছিল। বেশির ভাগ ঝরে গেছে। চোরাই রোদ টাল খাচ্ছে বারান্দার ফুটিফাটা লাল মেঝেতে। সামনেই একটা অয়েলপেন্টিং। মরার পর ভূতের অবস্থা। নিজেরাই হয়তো বলতে পারবেন না, চরিত্রটি কে।

পায়ের শব্দে বেরিয়ে এলেন প্রৌঢ়া। চওড়া লাল পাড় শাড়ি। সোনার মতো গায়ের রঙ। সমস্ত চুল পাকা রুপোর মতো। জরির কাজ করা একটি মাথা। আমাকে দেখে থমকে গেলেন। বেশ রাশভারি।

জ্যাঠামশাই বললেন, 'টাইম ইজ টু শর্ট। বলে ফেল, বলে ফেল।'

আমি রেকর্ডের মতো বাজতে শুরু করলুম, 'জ্যাঠাইমা তিন চারজনকে বলেছি। তারা ঠিকুজি চেয়েছে। সামনের ফাল্গুনেই...।'

প্রৌঢ়া ফোড়ার মতো ফেটে পড়লেন, 'দেখ বাবা, ওসব চালাকি আমি বুঝি। মাইনাস দশ, অ্যানিমিয়া, লো প্রেসার। দশ বছর আগে হলে কেউ দয়া করত। এখন আর ছোঁবে না। একমাত্র নার্সিংহোম বিয়ে করতে পারে। ফুলশয্যার খাটেই পড়ে রইল। ওইখান থেকে চলে গেল চিতায়। বুড়োর কথায় কেন আমাকে ধাপ্পা দিতে এসেছ!'

ডুরে নীল শাড়ি পরা বিষণ্ণ সকালের মতো একটি মেয়ে বেরিয়ে এল ঘর থেকে। চোখে ভীষণ পুরু কাঁচের চশমা। মেয়েটি বেরিয়ে এসে সরাসরি আমাকে বললে, 'বাবার কথায় কেন আমাকে অপমান করতে এসেছেন আপনি! আমি আর বাবা দু'জনেই খুব অসহায়। এই মহিলাই সব। দশ বছর আগে আমার দশবার বিয়ে হয়ে যেত। এই মহিলার পছন্দ হল না। এখন চিৎকার করে কি হবে? আপনি আমাকে বিয়ে করবেন?'

প্রৌঢ়া বললেন, 'পেটের মেয়ের কথা শুনলে বাবা!'

মেয়ে বললে, 'তুমি, তুমিই আমার জীবন নষ্ট করেছ। আমার করেছ.

আমার বাবার করেছ, সংসারে সব সময় চিতা জ্বালিয়ে রেখেছ আর খেয়ে খেয়ে, ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে গতর বাগিয়েছ। মুখে পান-জর্দা আর চব্বিশ ঘন্টা কোঁদল।'

মেয়েটি খপ করে আমার হাত চেপে ধরে টানতে টানতে বারান্দার রেলিং-এর ধারে নিয়ে গিয়ে বললে, 'তাকিয়ে দেখুন নীচে। ছেলেরা বিয়ে করে ওইরকম মেয়েকে। ওইরকম শরীর চাই। ওইরকম...।' মেয়েটি খোঁচা খেতে খেতে উন্মাদ হয়ে গেছে। আমাকে নারীদেহ দেখাতে লাগল নাম করে করে। সমস্ত পরিবেশ গদ্‌গদে হয়ে উঠল। মেয়েটি আমার দিকে তাকিয়ে তীব্র গলায় বললে, 'আমার কী আছে! আপনি তো ছেলে। বলুন, কোনটা চাইবেন, এইটা না ওইটা। মাসে একজন করে দেখতে আসবে ঠোঁট উল্টে চলে যাবে। আমি মুরগী না পাঁঠা!'

মেয়েটি হাউ হাউ করে কেঁদে ফেলল, 'উঠতে বসতে ঝ্যাঁটা। আমি না কি ডাইনী!'

বৃদ্ধ ছলছলে চোখে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'টাইম ইজ টু শর্ট। তুমি তাহলে এখন এস।' মেয়েটি মাথা নিচু করেছিল। মুখ তুলল। ধারাল মুখ। বড় বড় চোখ। রুক্ষ চুল। ভাঙা গাল বেয়ে জল ঝরছে। পাতলা ঠোঁট দুটো কাঁপছে। কান্না জড়ানো গলায় বললে, 'আমার জন্যে চেষ্টা করবেন না। আমার কিছু হবে না। অনেকেরই অনেক কিছু হয় না, মৃত্যু ছাড়া।'

বৃদ্ধ মেয়ের দিকে এগোতে গিয়ে স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে থেমে গেলেন। বয়লার ফাটবে।

নীচের ভরা যৌবনা পেয়ারা কাটছেন দাঁতে। রসাল আওয়াজ। ঘরের দিকে তাকিয়ে চিৎকার করে বলছেন,

'কি, আজ ডিউটি নেই! পড়ে পড়ে ঘুমচ্ছ? আলসের ডিম।'

॥ পাঁচ ॥

সত্যেন আমার সঙ্গে পড়ত। মোটামুটি বড়লোকের ছেলে। মাথাটাও বেশ ভাল ছিল। আমাদের লেখাপড়া হল না অভাবের জ্বালায়। সারাদিন গালে হাত দিয়ে বসে আছেন মা। একটা আধাখ্যাঁচড়া বাড়ি করতে গিয়ে বাবা ফতুর। সামলে ওঠার আগেই মারা গেলেন। আমি আর দাদা ঝুল ঝাড়ি, গ্রিল পরিষ্কার করি। মেঝে মুছি। আর ঢুকু ঢুকু জল খাই। আমাদের তো তখন

আর কিছুই নেই। বাড়িটাই নেশা। কল্পনায় দেখি বাড়িটা সম্পূর্ণ হচ্ছে। একতলার ওপর দোতলা উঠছে। বাইরেটা প্ল্যাস্টার হচ্ছে। রঙ নিয়ে দু'জনের গভীর আলোচনা। কল্পনায় আমরা পর্দা কিনে আনতুম। কল্পনায় বাথরুমে শাওয়ার লাগিয়ে বাথটব বসিয়ে দিতুম। গরম জল, ঠাণ্ডা জল।

শেষে দাদা বলত, 'কি মুশকিল বল তো, পেটটা জ্বলে যাচ্ছে।'

এই পেটের জ্বালা নিয়ে আমরা দু'ভাই বড় হয়েছি। বাবা চলে যাওয়ার পর ঝোলাঝুলি নিয়ে উপার্জনে বেরোতে হয়েছে। মা একটা একটা করে গয়না বিক্রি করেছেন। 'আমার এক ছেলে গেছে, দুই ছেলে আছে। সংসার আবার হাসবে।' সংসার হা হা করে হাসেনি। একটু মুচকি হেসেছে কখনো-সখনো।

সত্যেন আমার চেয়েও ভাল ছেলে ছিল, এমন আমি বলব না। সত্যেনের সুযোগ ছিল। সত্যেন হড়হড়িয়ে বেরিয়ে গেল। স্কুল থেকে কলেজ, কলেজ থেকে ডাক্তার। আমি হাঁ করে দেখতেই থাকলুম, সত্যেন বড় হতে হতে বিশাল হয়ে গেল। আকাশে ঠেকে গেল মাথা। বিলেত, আমেরিকা থেকে বড় বড় ডিগ্রি নিয়ে এল। সত্যেন কেন জানি না আমাকে খুব ভালবাসত। আশা দিত। বলত, প্রসাদ হেরে যাসনি। এমনও বলেছিল, তুই আমাদের বাড়িতে থেকে লেখাপড়া কর। বাবাকে বলে সব খরচের ব্যবস্থা করব। তোর মাথা আছে, তোর হবে। গরিবদের একটা বিশ্রী রকম তেঁটে অহঙ্কার থাকে। সাহায্য-টাহায্য নোবো না। মরে যাই সে-ও ভাল। আর বাধ্য হয়ে যদি কারোর সাহায্য নেয় তো কৃতজ্ঞতা দেখাবার আদিখ্যেতায় সাহায্যকারী পাগল হয়ে যায়। একসময় হাত জোড় করে বলে, ভাই, আমার ঘাট হয়েছে, এমন জানলে তোমাকে আমি সাহায্য করতুম না। যারা বড় হয় বড়লোক হয় তাদের এই সব ছেঁচড়ামো থাকে না। রাইট অ্যান্ড লেফ্‌ট তারা সাহায্য নেয়। সাহায্য ছাড়া তাদের জীবন অচল, অকেজো। সাহায্যকারীকে তারা মনে করে, টুথপিক। দাঁত খুঁচিয়ে ফেলে দাও। অনেক গুণ না থাকলে মানুষ বড় হতে পারে! সবচেয়ে বড় গুণ হল, ভুলে যাওয়া বিস্মৃতি, অস্বীকৃতি। মনে একটা ভীষণ তুচ্ছতাচ্ছিল্যের ভাব রাখতে হবে, ধ্যাস, শালা। আমার জন্যে করেছিস, সে তো তোর ফোর্টিন ফাদারের ভাগ্য রে বেটা। গরিব টাকা ধার নিলে, যতদিন না শোধ করতে পারছে, মরমে মরে থাকে। সামনে যেতে লজ্জা পায়। বড়লোক ঠেকায় পড়ে ধার নিলে ভুলে যাবেই যাবে। জীবনে শোধ করবে না। ডাঁটে ঘুরবে। আবার তার কাছেই চাইবে। কারণ বড়লোক এই সব সামান্য সামান্য ব্যাপারকে মনে করে সেবা। আমরা সাহায্য করিনি,

বিগ্রহসেবা করেছি। আমাদের সেবা করিয়া তোমরা ধন্য হও। বড় যদি হতে চাও ছোট হও আগে। ছন্দ মেলাবার লোভে কবি লোকটা ফেলে দিয়েছিলেন। লাইনটা হবে, বড় যদি হতে চাও ছোটলোক হও আগে।

সত্যেন সর্ব অর্থে এর ব্যতিক্রম। সত্যেনকে আমি এড়িয়ে চললেও সত্যেন আমাকে খুঁজে বের করত। এঁকেই আমি হীনমন্যতায় ভুগি। লোয়ারক্লাসের লোক। সকালের চায়ে যার ফ্লেভার থাকে না, ভাল বিস্কুট থাকে না, সে ব্যাটা তো ডাউনট্রডন। সে কেন সফল মানুষের আস্তাবলে। সে কালীবাড়ি যাবে, চরণামৃত খাবে, অসুখ করলে হোমিওপ্যাথি করবে, তাগা তাবিজ পরবে, শনিপুজোর সিন্নি খাবে রাস্তায় দাঁড়িয়ে। তার বউ সন্তোষী মার পুজো করে পথে পথে ঘুরবে গরুর খোঁজে।

সারাটা পথ সত্যেনের গবেষণায় কেটে গেল। দাদা একবার বললে, 'তোর ভাবনা দেখে মনে হচ্ছে, একটা ঝুঁকি নেওয়া হল। আমাদের মতো অভাবী লোক পাত্তা পাবে না রে! কলকাতায় প্রচুর বিগম্যান। তাদের ভিড়ে আমাদের দেখতেই পাবে না। আজকাল পাড়ার ডাক্তাররাই আমাদের ছাগল ভাবে। আমরা এখন গিভ অ্যান্ড টেকের টেকনিক্যাল যুগে আছি। জানিস তো, শনিবার বউকে আউটিং-এ নিয়ে গিয়ে তোয়াজ করলে তবেই রবিবারের প্রেম। ছেলে ক্লাসে স্ট্যান্ড না করলে এ-কালের মায়েরা চুমু খায় না! তুই মাস্তু, এ আমাকে কোথায় নিয়ে এলি বড়লোক পাড়ায়। অপমান পকেটে করে বাড়ি ফেরা!'

'দাদা, তুমি আমার সঙ্গে এসেছ। আমি তোমাকে অপমানিত হওয়ার জন্যে আনিনি।'

দাদা অতি কষ্টে আমার কাঁধে ভর দিয়ে চেম্বারে ঢুকলো। ট্যাকসি ভেতরের কোর্টইয়ার্ডে ঢোকেনি। ঢুকতে দেবে না। প্রাইভেট কার হলে বাধা ছিল না। দাদা বললে, 'দেখলি। শুরুতেই হোঁচট। অবস্থাটা বুঝিয়ে দিলে।'

'এতে ডাক্তারের কিছু করার নেই, অবাঙালি বাড়িঅলার ইংরেজি ব্যবস্থা। আমাদের দেশে মানুষ বড়লোক হলেই কলোনিয়াল ব্রিটিশদের মতো আচরণ করে। জলের বন্যা বইছে, টিসু পেপার দিয়ে পেছন মুছছে। কমোডের ওপর সিল্ক ধরে উবু হয়ে বসছে। যেন কার্নিসে ন্যাজঝোলা হুমদো পাখি।'

ডক্টর সত্যেন সেনের চেম্বার ছবির মতো। বসার ঘর, ডক্টরস চেম্বার, এগজামিনেশান চেম্বার। সুন্দরী মহিলা অ্যাপয়েন্টমেন্ট রাখছেন। পুটুস পুটুস ইংরেজি। বড় ডাক্তার দেখাচ্ছেন বলে রোগীদেরও ভীষণ ডাঁট। অবশ্য ডাঁট

আর ফাঁটেই দেশ চলছে। আর দেশ জননী ভিক্ষাপাত্র হাতে ডলার সম্রাটের সামনে নতজানু। টাকার এখন পয়সাদর।

শেষে ভদ্রমহিলাকে বলতেই হল, 'একটু সরে বসুন, দেখছেন তো রোগী দাঁড়াতে পারছে না।'

'ও ইয়েস।'

কষ্টে সরলেন। প্রচুর জায়গা, তবু যেন দয়া। পাশে তাঁর স্বামী। মনে হয় বড় কোম্পানির এগজিকিউটিভ। এমনভাবে তাকালেন, যেন আমি তাঁর অধস্তন। টার্গেট ফুলফিল করতে পারিনি। বাঙালি পরিবার। তবু ইংরেজি। কালচার মানেই ইংলিশ কালচার। খাচ্ছে ইলিশ বলছে হিলসা। প্রভু! এ কেয়া তামাশা!

অ্যাপয়েন্টমেন্ট রক্ষাকারিনী ললনা একটু কেরামতি করতে চাইলেন, না, না, উইদাউট অ্যাপয়েন্টমেন্ট অসম্ভব। কোথাও বাধা পেলে আমার ভেতর থেকে একটা দুষ্ট প্রসাদ বেরিয়ে আসে। তখন আর তাকে বাগে রাখা যায় না।

'অ্যাপয়েন্টমেন্ট'! বলে, আমি দাদার শেখানো সেই থিয়েটারের হাসি। ভিলেনরা স্টেজে রেপ সিনে যে হাসি ছাড়ে। অ্যাপ্‌পয়েন্টমেন্ট।

আমি জানতুম সত্যেন ছুটে আসবে। আসতে বাধ্য। ফ্যাশানেবল ডাক্তারখানায় এ কি অত্যাচার!

সত্যেন আমাকে দেখে বললে, 'এ কি তুই? তুই হাসলি?'

'ক্ষমা চাইছি ভাই। মিসিবাবা আমায় তাড়িয়ে দিচ্ছিলেন। আমার আর কোনো উপায় ছিল না।

অতি কষ্টে দাদাকে নিয়ে এসেছি। তুই ছাড়া আমার কেউ নেই।'

'একটু বোস।'

দাদার উল্টো দিকে এক যুবকের পাশে বসলুম। সবাই অবাক হয়ে আমাকে দেখছেন। বউদির যত্নে চেহারাটা এখনো তেমন টসকায়নি। সারা দিন মাইলের পর মাইল হাঁটি। যা খাই তাই হজম। আর গরুর মতো শাকপাতাই তো খাই। একসময় যোগাসনে ঝোঁক হয়েছিল। আমার গুরু বলেছিলেন, নিরামিষ হল স্বাস্থ্যের পক্ষে সবচেয়ে ভাল। তিনি আবার একজন প্রখ্যাত চিকিৎসক। দীর্ঘকাল জার্মানিতে ছিলেন। যোগের ওপর জার্মান ভাষায় বিশাল বই আছে। ম্যাকসমুলার ভবনে জার্মান ভাষা শেখাতেন। এখন পরিপূর্ণ আশ্রমজীবনে পরম সাধক। তাঁর গুরুর সমস্ত রকমের সিদ্ধাই ও যোগানুভূতি ছিল। সিদ্ধ মহামানব ছিলেন তিনি। আমি সেই গৌরীদার কাছে

জীবনের সুর বাঁধতে চেয়েছিলুম। তিনি বলেছিলেন এক গ্রাম জৈব প্রোটিন এই আবহাওয়ায় হজম করতে গেলে তিনশো ডন, ছশো বৈঠক মারতে হবে। তুমি পারবে? পারবে না যখন তখন মাটন চিকেনের জন্যে ভেবে মরছ কেন? শাকপাতা খাও, সৎ চিন্তা করো। সব পলিউসানের সেরা পলিউসান, থট পলিউসান। শিশ্নোদরপরায়ণ মানুষেরই যত ব্যাধি। মনটাকে ঘোরানোই হল যোগ। এখান থেকে তুলে ওখানে রাখো। উদর থেকে তুলে রাখো মাথায়।

পাশের যুবকটি ফিস ফিস করে বললে, 'ডাক্তারবাবু আপনার বন্ধু?'

'একসঙ্গে স্কুলে পড়েছি।'

'জানেন তো, আমি ইউনিভার্সিটির ছাত্র। আমার বাবা সামান্য চাকরি করেন।'

'আরে সেইটাই তো একালের গল্প। এতে দুঃখের কি আছে?'

'না, সে কথা বলছি না। সে আমি জানি। এটা ব্যবসাদারের দুনিয়া। ওটা কোনো প্রবলেম নয়। প্রবলেম হল, আমার বাঁ পাটা ক্রমশ সরু হয়ে যাচ্ছে। ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়ছে। সবাই বলছে বোন টিবি।'

'তুমি তো ভাল জায়গায় এসে পড়েছ। কলকাতার এক নম্বর।'

'না, আমি তা বলছি না। আমি তো ছাত্র। এঁর কাছে চিকিৎসার অনেক খরচ। আমি তো ছাত্র! আচ্ছা, আপনি যদি একটু বলে দেন। দেখুন আমার জীবনটা তো মোটামুটি নষ্টই হয়ে গেল।

বাবা আলসারের রোগী, আমার মাথার ওপর দুই বোন, বিয়ে হয়নি।'

'উঃ, সেই এক বস্তাপচা গল্প। নতুন কিছু বলো।'

'নতুন!'

ছেলেটি একটু দ্বিধায় পড়ে গেল। শেষে ভেবেচিন্তে বললে, 'নতুন গল্প তাহলে লিখতে হয়।'

'তোমার জীবনে কোনো আশা ছিল না? স্কুলে রচনা লেখনি! তোমার জীবনের লক্ষ্য কী? বড় হয়ে কী হতে চাও?'

'হ্যাঁ লিখেছি। সে তো বই দেখে মুখস্থ করে। সেটা তো আমার হতে চাওয়া নয়, রচনা বইয়ের হতে চাওয়া।'

'রাইট, হাজার হাজার ছেলে, বছরের পর বছর পনেরো কি কুড়িটা নম্বরের জন্যে সেই একই হতে চাওয়ায় ভুগে ভুগে মরছে। আর যা হবার তাই হচ্ছে। যা হবার তাই হবে। মন খারাপ করছ কেন। এই তো দেখ আমার যা হবার তাই হয়েছে। ওই দেখ, আমার দাদা, যা হবার তাই হয়েছে। আমার একটা

ভাই ছিল। তার নাম ছিল তীর্থ। বেঁচে থাকলে তোমার বয়সীই হত। সে ছেলেবেলায় হিন্দিতে, কুছ পরোয়া নেহি বলার চেষ্টা করত। পারত না। বলত, কুছ পরোটা নেহি। আমিও তাই বলি, কুছ পরোটা নেহি।'

'আপনার অনেক সাহস। আমার ভীষণ ভয় করে।'

'গঙ্গায়, আউটরামঘাটের কাছে একটা জাহাজ দাঁড়িয়েছিল। একটা পাখি এসে মাস্তুলে বসল। বেশ লাগছে। ফুরফুরে বাতাস। আরামসে বসে আছে। খেয়াল নেই, জাহাজ দিয়েছে ছেড়ে। বসে আছে পাখি। অন্যমনস্ক। জাহাজ এদিকে মহাসমুদ্রে গিয়ে পড়ল। হঠাৎ পাখির খেয়াল হল, এই রে, তীর কোথায়! পাখি উড়ল, উড়তে উড়তে প্রথমে গেল উত্তরে। কোথায় তীর। ক্লান্ত হয়ে ফিরে এল জাহাজের মাস্তুলে। বিশ্রাম নিয়ে গেল দক্ষিণে। কোথায় কি? জল আর জল। ফিরে এল হতাশ হয়ে। গেল পুবে। গেল পশ্চিমে। জল আর জল। অকূল সমুদ্র। তীর নেই। পাখি তখন নিশ্চিন্ত হয়ে মাস্তুলে বসল। চলো জাহাজ, যেখানে নিয়ে যাবে, সেইখানেই যাবো। যে-শক্তি জীবন জাহাজ চালাচ্ছে, তার হাতে নিজেকে সমর্পণ করে বসে থাকো, ছটফট কোরো না। কেয়া বাত! তোমার কথা, আমি ডাক্তারকে বলব। তোমার নাম?'

'মিলন চৌধুরী।'

ডাক পড়ল আমাদের। বুকটা ধড়াস করে উঠল। যেন নিয়তি ডাকছে।

সত্যেন দাদার পাটা দেখল। জোর আলোয়। আমি একবার তাকিয়েই চোখ ফিরিয়ে নিয়েছি। আমার সাহসী বলে নাম আছে। দাদার পায়ের ব্যাপারে আমার সাহস নেই। সত্যেন যে জায়গাটাই টিপছে, সেখান থেকে বুজ বুজ শব্দ বেরোচ্ছে। আমি ডাক্তার নই; কিন্তু অবস্থা যে ভয়ঙ্কর এটুকু বোঝার মতো জ্ঞান আছে আমার।

সত্যেন হাত ধোবার জন্যে উঠে যেতে যেতে ইশারায় আমাকে পাশের ঘরে ডেকে নিয়ে গেল,

'কি করে এনেছিস প্রসাদ? তোর কোনো ধারণা নেই। এই উদাসীনতার কোনো ক্ষমা নেই। তোরা এতটা সেলফিশ, ক্রুয়েল! দিস ইজ ক্রিমিন্যাল নেগলেক্ট। পাটা কেটে বাদ দেওয়া ছাড়া, দেয়ার ইজ নো আদার ওয়ে। টাইমলি গোটাকতক অ্যান্টিবায়োটিকও যদি পড়ত।'

'বলছিস কি? কেটে বাদ দিতে হবে! তোর মতো ডাক্তার এমন কথা বললে চলে কি করে?'

'আই অ্যাম নট গড, প্রসাদ। ইট ইজ এ লস্ট কেস। আমি হাসপাতালে নোবো, সব টেস্ট করাব, তবে জেনে রাখ, নো চানস। বিশ্বাস কর, আমার চোখে জল এসে যাচ্ছে।'

আমি একটা কিছু বলতে যাচ্ছিলুম, সত্যেন ভীষণ রেগে গিয়ে, গলা খাটো করে বললে, 'শাট আপ। ইট ইজ শিয়ার নেগলিজেনস।'

'অ্যাকসিডেন্টে সামান্য একটা চোট, অল্প একটু কাটা ছেঁড়া। এ তো হামেশাই হয়। আমরা বুঝতে পারিনি।'

'যখন দেখছিস কমছে না, ক্রমশই বাড়ছে, ফুলছে, রস জমছে, তখন কেন আমার কাছে এলি না!'

'দাদা কিছু বলেনি, চেপে রেখেছিল।'

'তোমরা ঘুমোচ্ছিলে, বউদি ঘুমোচ্ছিলেন! এ জিনিস চেপে রাখা যায়!'

'আসলে বউদি তো ছেলে, মেয়েদের নিয়ে ব্যস্ত থাকে।'

'ওই হয়, গাছ ভুলে সবাই ফল নিয়েই ব্যস্ত হয়।'

দাদাকে নিয়ে ট্যাকসিতে উঠলুম। ওরই মধ্যে খেয়াল করে মিলনের কথা বললুম। সত্যেন একটু অসন্তুষ্টই হল। বললে, 'কিছু লোক আছে, যাদের পরোপকারটা প্রায় অসুখের পর্যায়ে পড়ে।' কথাটা ভেবে দেখার মতো। আমি বাইরের লোকের যত খবরনি, বাড়ির লোকের তত খবরনি না। পেয়েছি, নিজেকে খুঁজে পেয়েছি। নাম, প্রশংসা, এই সবের জন্যে প্রচ্ছন্ন একটা মোহ ছিল আমার, ছেলেবেলা থেকেই। নাট্যকার হতে চেয়েছিলুম। কবি হওয়ার বাসনা ছিল আমার। কিছুই তো হল না। এখন ঝোলাঝুলি ফুঁড়ে সেইটাই বেরোতে চাইছে অন্যভাবে। আত্মভোলা, সমাজসেবী, পরোপকারী। মারো শালাকে। যে নিজের দাদা ভুলে অন্যের বাবাকে নিয়ে ব্যস্ত হয়, সে ব্যাটা আত্মপ্রবঞ্চক।

পেছনের আসনে, আমি আর দাদা পাশাপাশি। আমাদের ট্যাকসি চাপা, গরিবের বেদানা খাওয়ার মতো। খুব অসুখ করেছে, ইউনিয়ান কাবহিডের বড়লোক ভায়রাভাই দেখতে এসেছে বেদানা নিয়ে। বাধ্য হয়ে এসেছে, বউয়ের চাপে। বড় এগজিকিউটিভরা সাধারণত আত্মীয়-স্বজনদের আদৌ পছন্দ করে না, বসের শালির টনসিল আউরে উঠলে কাশ্মীরি শালের টুকরো বা মায়ামির মাফলার নিয়ে ছুটে যায়। গলায় সাত প্যাঁচ মেরে সুন্দরী শূন্যে দৃষ্টি তুলে খুকুর খুকুর কাশবে। এক একবার কাশি একটা করে লিফট। সেই বড়সায়েব আঙুর, বেদানা নিয়ে বেজার মুখে এসেছেন। আজকাল আবার

বড়সায়েবরা বিলিতি ওডিকোলন ব্যবহার করেন। ঘামের গন্ধের সঙ্গে মিশে মিশে পোর্টেবল এসপ্ল্যানেড টয়লেট। রাতের দিকে একটু খেতেই হয় এগজিকিউটিভ টেনসান রিলিজের জন্যে। ফলে মুখটা যেন ফ্যাটি চন্দ্র। মধ্যভাগ জালা। খাড়া রেখেছে বাঁখারির মতো দুটো পা। ভায়রা শুয়ে আছে মলিন বিছানায়। হ্যান্ডলুমের শস্তা চৌখপ্পি চাদর। নোনা ধরা ঘর। মাথার খুপরি জানলা। পাল্লা এক কব্জায় হেলে আছে। বাইরের নর্দমার পিলু বারোয়া গন্ধ। নিম্ন মধ্যবিত্তের সংগীত প্রীতি বাড়ছে। প্রতিবেশীর টিনের টুইনওয়ানে কাঁচের গলায় তীক্ষ্ণ গান। মহামান্য অতিথি একই সঙ্গে বেদানা কাম বেদনা নামিয়ে সরে পড়লেন। সেই বেদানা।

দু'তিন বছরে পল্টু একবারই ট্যাকসি চাপে, বউকে যেদিন হাসপাতালে নিয়ে যেতে হয় ডেলিভারির জন্যে। পাশে কাতরাচ্ছে বউ, জীবন আসার যন্ত্রণায়। পল্টুর চোখ মিটারের দিকে। মনে মনে হিসেব, যা দেখাচ্ছে তার ওপর কত পার্সেন্ট, ফর্টি না সিক্সটি ! দশ টাকা একস্ট্রা। জানলার বাইরে পচা কলকাতা উল্টো দিকে ছুটছে। কে আর দেখে। চালক জানে, এ মাল পয়দালই মারে। বড়জোর সাইকেল রিকশা। কারণ জানলার কাচ নামাতে গিয়ে দরজা খুলে ফেলে ; আর দরজা খুলতে গিয়ে লক ধরে টানাটানি করে। রিকশাও এখন দাদাদের কল্যাণে আমাদের হাতের বাইরে। রিকশা এখন রাজনীতির বাহন।

দাদা আমার হাতে হাত রেখে বললে, 'কি বললেন, প্রসাদ। নো হোপ !'

'না, সে কথা বলেননি, তবে তোমার জন্যে আমাকে যাচ্ছেতাই গালাগাল করেছে। তোমার যে এই অবস্থা আমাকে জানাওনি কেন ?'

'আমি দেখছিলুম।'

'তুমি এক মাস ধরে দেখছিলে ?'

'আরে ছেলেবেলায় ফুটবল খেলতে গিয়ে এইরকম কত হয়েছে। প্রথম সাইকেল শিখতে গিয়ে হয়েছে কতবার। কিছু না করেই সেরে গেছে।'

'তখন বয়েস কম ছিল। তখন তোমার সুগার ছিল না দাদা।'

'সুগার যে আছে জানব কেমন করে !'

বউদি দেখেনি ?'

'কি করে দেখবে ? দেখালে তো দেখবে ! আমরা তো সেপারেট বিছানায় শুই।'

'জামাকাপড় বদলাবার সময় দেখা যায় না !'

'সে আমি একটু লুকোলুকি করেছিলুম। দেখতে পেলেই পিউ বুলের দুধ,

ডিম বন্ধ করে ডাক্তার বদ্যির পেছনে ঢালবে। জানিস তো ছেলেমেয়ে একটা নেশা। টবের গাছ যখন লকলকিয়ে বাড়ে, নতুন নতুন পাতা ছাড়ে তখন কেবলই ইচ্ছে করে সার দি। আরো সার, আরো বাড়। আচ্ছা ধর, আমার যদি একটা কিছু হয়েই যায়, তুই একটু সামাল দিতে পারবি না প্রসাদ ?'

চুপ করে রইলুম।

'কি রে কিছু বলছিস না কেন ?'

'দেখছি, তোমার কল্পনা, তোমাকে আরো কত দূরে নিয়ে যায় !'

দাদাকে নিয়ে বাড়িতে ঢোকা মাত্রই তিনটে প্রাণী ঘিরে ধরল। কেউ প্রশ্ন করছে না, কিন্তু মুখগুলো সব প্রশ্ন হয়ে আছে। দাদা নিজেই গিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ল। বউদি আড়ালে নিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করল,

'কি ব্যাপার !'

নিজেকে এতক্ষণ বেশ,কড়া কড়কড়ে রেখেছিলুম, আর পারলুম না। বুকটা ফেটে যাওয়ার মতো হল। অতীত যেন মিছিল করে মনের পথ ধরে চলেছে। যখন ছোট, হয় তো কেউ রসগোল্লা দিয়েছে। দাদাকে একটা আমাকে একটা। দাদা নিজেরটা থেকে আধখানা ভেঙে আমার মুখে ঢুকিয়ে দিলে। লুচি ভালবাসি নিজের পাত থেকে তুলে দুটো আমার পাতে ফেলে দিলে। অদ্ভুত স্নেহমাখা মুখে বললে, খা খা। আশ্রমে গিয়ে লাইন দিয়ে আমার জন্যে ফ্রি দুধ, কি ফ্রি গমের খিচুড়ি নিয়ে আসছে। প্রসাদের চেহারা ফেরাতে হবে। দাদা যে পিতৃতুল্য, আমার দাদা তার জীবন্ত উদাহরণ।

বউদির দিকে তাকিয়ে আমি কেঁদে ফেললুম। ঝরঝর করে জল নামল। আমি কি বলব ! আমার দাদার একটা পায়ের আধখানা চেলা কাঠের মতো কেটে নেবে, এ আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারি না। আমার দাদার অভিনয় আমি দেখেছি। স্টেজের এ-পাশ থেকে ও-পাশ দাপিয়ে বেড়াচ্ছে চন্দ্রগুপ্ত। তখন সে সত্যই সম্রাট।

বউদি বুদ্ধিমতী। আর কোনো প্রশ্নই করল না। জলই উত্তর।

॥ ছয় ॥

গঙ্গার ধারে আমার একটা প্রিয় চায়ের আস্তানা আছে। ছেঁচা বেড়া। ভেঙে পড়ার অবস্থা। অদূরেই একটি নিরালা ঘাট। স্থানীয় প্রাচীন মানুষের বিশ্বাস পুরী যাওয়ার পথে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ক্ষণকাল এইখানে বিশ্রাম

করেছিলেন। সেই কারণে ঘাটের নাম চৈতন্যঘাট। এরই কিছু দূরে গঙ্গার আরো নাবিতে ছোট একটি আশ্রম মতো আছে। গৃহস্থাশ্রম। ছেলেবেলা থেকেই তার নাম শুনে আসছি, কাঁথাধারীর মঠ। মহাপ্রভু তাঁর কাঁথাটি এইখানে ফেলে গিয়েছিলেন। চৈতন্যঘাটের কিছু দূরেই স্বামী সত্যানন্দের আশ্রম। সেখানে কাঁচের মন্দির। মহাপুরুষের সাধনপীঠ বলেই মনে হয়। উদ্যানঘেরা শান্তিবন। মাঝে মাঝে ময়ূর ডাকে সাধকের আর্তস্বরে, কোথায়, কোথায়। ভেতরে ভয়ে ঢুকি না। আমার স্থান কাঙালি ভোজনের পঙক্তিতে। দেবস্থানের ধূপগন্ধী পরিবেশে এ শর্মা এক অপবিত্র উৎপাত। নিজের গাড়ি না থাকলে ধর্ম হয় না।

এ তল্লাটে সবই প্রায় বাগানবাড়ি। অতীতের বাঙালিরা খুব খেলিয়ে বাঁচতে চেয়ে এক শতাব্দীতেই স্মৃতি। তাঁরা বোঝেননি, বাঘ, সিংহর চেয়ে ছারপোকার পরমায়ু বেশি। প্রায় অমর। অন্যের রক্তাশ্রিত। টিপে মারলেও মরতে চায় না। চিঁড়ে চ্যাপ্টা টেকনিক। কলার ধরে ঝুলে থাকে। সেইসব বাগানবাড়ি আপাতত ভূতের বাড়ি। প্রোমোটাররা জোঁকের মতো লেগে আছে। উচ্চ মধ্যবিত্ত জীবেদের জন্যে খাঁচা বানাবে, চারপাশে বস্তির কেয়ারি করা। টবের জীবন। একটি কর্তা, একটি গিন্নি। মোরগ আর মুরগী। একটি আদুরে ফুলোফুলো ছানা। সে পড়ে কমিকস, সে দেখে টেনিস, সে খায় কলা, বাপ মারে বৈঠক, মা মারে ডন, ইংলিশ মিডিয়াম। আকাশচুম্বীর তলায় বস্তি তো চাইই। নিজেদের তো কুটোটি নাড়ার ক্ষমতা নেই। কাজের লোকের সাপ্লাই চাই। এয়ারকন্ডিশান্ড অফিস, ফ্লোরেসেন্ট জ্যোতি, টিভির হাই পাওয়ার লাইট। কি দুঃখ। চোখটা যেতে বসেছে ভাই। খুব করে গাজর খাই। সূর্য পুবে ওঠে বইয়েতেই পড়েছি। ভোরে উঠব কি? লেট নাইট টিভি। আঁতেলের নতুন নাম হয়েছে, আঁটুল। আঁটুল বাঁটুল শ্যামলা সাঁটুল। যারা জীবনে ঝাঁটা ধরেনি, শুধু কথার বাঁটুল ঝেড়ে গেল, অ্যাডভাইসার, ফিলজফার, তারাই আঁটুল। আঁটুলরা ইংরিজি ছবি দেখবেন। ডায়ালগ বোঝা দুসাধ্য। তবু বলবেন, কি ক্যামেরা, কেয়া এডিটিং, ক্যায়সা কেরেক্টারাইজেশান। তারপর বলবেন, নট দ্যাট হট। সূর্য দেখা হল না বলে, ইনফ্রারেড আলো কমলালেবু রঙের শেডে ঢেকে সূর্য উপাসনা করেন। পাছে ধর্ম এসে যায়। মৌলবাদী বলবে শিক্ষিত সমাজ। যদিও ঠাকুমার নাম ছিল ক্ষান্তমণি, ঠাকুরদার সাতকড়ি। সে তো পাল্টানো যাবে না, বউয়ের নাম ডলি, ছেলের নাম ববি, মেয়ের নাম পলি। প্রায়শ্চিত্ত। জবাকুসুম সঙ্কাশংয়ের ইংরেজি,

লাইক জবা ফ্লাওয়ার ও সান, হু ইজ কাশ্যপ আই ডোন্ট নো, রেভিয়েটিং ইন দি স্কাই, কিওর মাই সিন, হুইচ ইজ এ সর্ট অফ গাউট, অ্যান্ড এ টাচ অফ অ্যাজমা, ওভার অ্যান্ড অ্যাবাভ ওয়াইফস ক্রমস্টিক।

গৌরাঙ্গদার চায়ের দোকান। তারাই খদ্দের, যারা চাটাকে আহার বলে মনে করে। খিদে খুন করার আরক। আদুরে কাঁচা লিভারকে পাকা সংগ্রামি লিভার করে দেয়। ট্যাংরায় গিয়ে দেখেছি চামড়া ট্যান হচ্ছে। চা হল লিভারের ট্যানিন।

একটা একশো পাওয়ারের আলো ছাড়া আর কোনো ভজঘট নেই। একপাশে মা কালীর ক্যালেণ্ডার বেঁকে ঝুলছে। আগে মা কালীর সঙ্গে রামপ্রসাদকে জোড়া হত, এখন রামকৃষ্ণকে। আমাদের এইটাই রীতি। রামপ্রসাদ, রামকৃষ্ণ, নেতাজী, অরবিন্দ। সেলুনে টেলারিং-এ, লন্ড্রিতে, চা, পান-বিড়ি, মিষ্টির দোকানের সঙ্গে যুক্ত হবেনই। ভালবাসা, ভক্তিশ্রদ্ধা নয়, লোভ আর লাভ। নামে যেন কাটে মা গো আসে যেন লক্ষ্মী।

একটা নড়বড়ে টেবিল। তার ওপর টিন পাতা। কেলে ভুতো চেহারা। তার ওপর ছটাকি গেলাস, কেটলি, বিচিত্র ছাঁকনি, দুধের জায়গা। সবটাই প্যাচপ্যাচে জলে ভাসমান। কাছে গিয়ে দাঁড়ালে ভ্যাপসা একটা গন্ধ। নায়ক গৌরাঙ্গ। একটা চুলও কাঁচা নেই। মুখে কোনো ভাব নেই। নিরেট একটা মানুষ। পঞ্চাশ, ষাট বছরের জীবনে যা দেখেছেন সেই অভিজ্ঞতায় প্রস্তরীভূত।

পেছনে গঙ্গা। ফর ফর করে বাতাস আসছে পতাকার মতো। থামলেই মশা। সামনে সরু রাস্তা। রাস্তাটা আমাদের ছেলেবেলায় ভয়ঙ্কর রোমান্টিক ছিল। দু' পাশে বাগান বাড়ি। বিশাল বিশাল পাঁচিল। নানা রকমের গাছের ডাল ঝুলে আছে। অদ্ভুত অদ্ভুত ফুল। আকুল করা গন্ধ। কোনো কোনো বাগান বাড়ির দোতলায় ঝাড়লণ্ঠন ঝুলত। ঝুল বারান্দায় এক লহমার জন্যে দেখা যেত কোনো মহিলাকে। আগুনের মতো সুন্দরী। শোনা যেত অর্কেস্ট্রা। তখন সব ল্যাম্পপোস্টে আলো জ্বলত। পথ ছিল মসৃণ, আবর্জনামুক্ত। কোনো বাগানবাড়ির গেট হঠাৎ খুলে যেত। দুলকি চালে বেরিয়ে আসত ল্যান্ডো। ফিনফিনে আদ্দির পাঞ্জাবী, সরু গোঁফ, কার্তিকের মতো বাবু, পাশে সিল্ক মোড়া লাস্যময়ী বাইজী, হিলহিলে আতরের গন্ধ, দেয়ালে দেয়ালে ঘোড়ার চলনের খবল খবল প্রতিধ্বনি। ঐশ্বর্যটা তখন কি সম্ভ্রমের ছিল!

আর এখন। স্বাধীনতায় পাক ধরার পর পচ ধরেছে। দাদার পায়ের মতো। পথের সীমানা আছে খানাখন্দে ভরা। দু' হাত অন্তর আবর্জনার ঢিবি। ভ্যাটভেটে নর্দমা। চৈতন্যঘাটের লাগোয়া ত্রিতল যাত্রীনিবাস সমাজসেবীদের কল্যাণে ভেঙে ফেলতে হয়েছে। ঘাট আত্মহত্যার মানসে খণ্ডেখণ্ডে নিজেকে বিসর্জন দিচ্ছে পুণ্যসলিলে। গঙ্গার তীর গণটয়লেট। আমরা ভুক্কার-পার্টি। আমাদের জন্যে এর চেয়ে বেশি আয়োজনের তো প্রয়োজন নেই।

গৌরাঙ্গদা জানেন, খুব বিচলিত হলে আমি এই দোকানে আসি ভাবার জন্য। কোণের দিকে বসি। আর ভেবে যাই। গৌরাঙ্গদা যেন দম দেওয়া কাঠের পুতুল। ঠকাস করে এক গেলাস চা আমার সামনে নামিয়ে দিয়ে বললেন, 'কি সমস্যা ? পারিবারিক না সামাজিক ?'

'ভয়ঙ্কর পারিবারিক তার চেয়ে একটু কম ভয়ঙ্কর সামাজিক।'

'ভাবো, ভেবে যাও। ওই স্বাধীনতাটা এখনো আমাদের আছে।'

'আপনি কেমন আছেন গৌরাঙ্গদা ?'

'ওই প্রশ্নটা আর কোরো না। ভীষণ বোকা বোকা প্রশ্ন। আমি জানি তুমি কেমন আছ, তুমি জান আমি কেমন আছি। তবে হ্যাঁ, তোমাকে একটা সুখবর দি।'

'কি গৌরাঙ্গদা ?'

'আমার ছুটি হয়ে যাচ্ছে। জেলারবাবু নোটিস দিয়েছেন।'

'তার মানে ?'

'তার মানে আমার লিভারে ক্যানসার হয়েছে। আর তো আমাকে কেউ আটকে রাখতে পারবে না।'

'সে কি ? কে বলেছে আপনাকে ?'

'হাইকোর্টের রায়। নড়চড় হবার নয়। হচ্ছিল অম্বলের চিকিৎসা। অম্বলের আর কি চিকিৎসা হবে ! বড়ি খেয়ে খেয়ে পেটে চড়া পড়ে গেল। তখন হুকুম হল স্পেস্যালিস্টের কাছে যাও।'

'কি চিকিৎসা হচ্ছে !'

'এ রোগের কোনো চিকিৎসা নেই। তুমিও জানো আমিও জানি। তাই বসে আছি পথ চেয়ে ফাগুনের গান গেয়ে।'

'যন্ত্রণা আছে ?'

'মাঝে মাঝে উঠছে। পেটটা সব সময় আগুনের মতো জ্বলছে। প্রথম

প্রথম ভাবতুম খিদে। পরে সন্দেহ হল। এই বয়সে এত খিদে এল কোথা থেকে ! এ তো খাওয়ার পেট নয়, না খাওয়ার পেট। সেই ভাবেই তো ট্রেনিং দিয়ে রেখেছি সারা জীবন। এখন ওই জ্বলছে। উনুন জ্বলছে সব সময়।'

'এই শরীরে দোকান চালাচ্ছেন ?'

'তা কি করব ! যখন আর পারব না শুয়ে পড়ব। ধরো আর দিন সাতেক। খাওয়া তো বন্ধই হয়ে গেছে।'

'বাড়ির লোক কি করছে ?'

'যা করা উচিত। ভীষণ চিন্তা করছে। ভীষণ চিন্তা।'

বোকার মতো বসে রইলুম। নদীগর্ভে অন্ধকারের স্রোত বইছে। শিবমন্দিরে লেটের পুরোহিত টিংটিং ঘণ্টা বাজিয়ে পুজো শুরু করেছেন। জীবন দীপের মতো দূরে দূরে টিপ টিপ আলো জ্বলছে। নিঃসঙ্গ নাবিকের মতো লণ্ঠন ছইয়ের মধ্যে রেখে মাঝ গঙ্গায় ভেসে চলেছে একটা নৌকো। অক্ষম মানুষ আর কি করতে পারে ! আমার মতো এক অক্ষম। অক্ষমের জন্যে কবিতা, গেঁয়ো দর্শন। দুটি মাত্র উপমা, জীবন আর মৃত্যু। দুই তীর। মাঝে এক পারাবার। তার নাম জীবন পারাবার। এক মাঝির কল্পনাও থাকবে। জীবন-পারাবারের মাঝি। আমাদের মতো অশিক্ষিত মানুষের জীবন দর্শন এই সবের মধ্যেই ঘুরে বেড়াবে। বেড়াতে বেড়াতে একটা ভাবালুতা আসবে। এক ধরনের তৃপ্তি, কত ভাল ভাবতে পেরেছি, কি উচ্চ চিন্তা ! জীবনটাকে ধরেই ফেলেছি। সব রহস্য ফাঁস হয়ে গেছে।

একটা ধোঁয়া ধোঁয়া, আলো-অন্ধকার পরিবেশে গৌরাঙ্গদা বসে আছেন পটের মতো। সামনে মৃত্যুর চেয়েও বিমর্ষ রাস্তা। আমার সামনে খালি গেলাস। আর এক গেলাস চায়ের বাসনা। অসুস্থ একটা মানুষকে হুকুম করব ! উঠে এলুম নিজেই, 'আমি আর একটা চা তৈরি করেনি গৌরাঙ্গদা ?'

'আমি কি করতে আছি ?'

'আপনি একটু বিশ্রাম নিন না। এই শরীর !'

'বাইরে কিছু বোঝা যায় ?'

'না, তা অবশ্য যায় না।'

'ঘুণ পোকা দেখা যায় ?'

'না।'

'ভেঙে পড়লে, তখন বলে ঘুণ ধরেছিল রে ! যাও বোসো, আমি দিচ্ছি। জীবনে তো চা ছাড়া আর কিছু করতে শিখিনি। নাচতে নাচতে যাওয়ার মতো

চা করতে করতেই যাই।'

আবার এসে বসে পড়লুম তেলা বেঞ্চিতে। এতক্ষণ লক্ষ করিনি, একটা আদুরে বেড়াল তলায় বসে আছে সুখী, কোমল ভঙ্গিতে। কাবুলী বেড়ালের জাত। মানুষের চেয়ে গৌরাঙ্গদা কুকুর আর বেড়ালেরই বেশি ভক্ত। চা এসে গেল। আজ আর কোনো খদ্দের নেই। ঘরে ঘরে টিভি এসে গেছে। সন্ধের পরেই পল্লী নির্জন।

ভোঁ করে স্টিমারের বাঁশি বাজল দূরে। কিছু শব্দ আছে, কিছু গান আছে, কানে এলেই মুহূর্তে ছেলেবেলায় ফিরে যাই। স্টিমারের ভোঁ, কাঁসর ঘণ্টা শাঁখের শব্দ, ব্রিজের ওপর দিয়ে রেল গাড়ি চলে যাওয়ার শব্দ, কিশোরীর গলায় দাদা-ডাক, গরুর হাম্বা আর দোয়েলের শিস, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের কিছু গান, এই বালুকাবেলায় আমি লিখেছিনু, একটি সে নাম আমি লিখেছিনু, আজ সাগরের ঢেউ এসে...

আলোর মালায় সেজে চলেছে পোর্ট কমিশনার অথবা রিভার ট্রাফিকের স্টিমার। উত্তরে চলেছে। গৌরাঙ্গদা ছোট্ট একটা বই বের করে পড়ছেন। দেখে মনে হচ্ছে, পকেট গীতা। দর্শনের পরেই কবিতা। অন্ধকার গঙ্গার দিকে তাকিয়ে জীবনানন্দ মনে পড়ে গেল। কবিতা হল মনের টুথব্রাশ :

সেদিন শীতের রাতে সোনালি জরির কাজ ফেলে
প্রদীপ নিভায়ে রব বিছানায় শুয়ে
অন্ধকারে ঠেস দিয়ে জেগে রব
বাদুড়ের আঁকাবাঁকা আকাশের মতো
স্থবিরতা, কবে তুমি আসিবে বল তো।

হঠাৎ নিজের আঙুলের দিকে নজর পড়ে গেল। বোধ হয় স্থবিরতার খোঁজে তাকিয়ে ছিলুম। সামান্য আলো, তবু মহিমদার দেওয়া রুবির আংটি পায়রার রক্তের মতো জ্বলজ্বল করছে। শুনেছি রুবি খুব দামি। দাদার অপারেশানের খরচ এই তো আমার আঙুলে ; কিন্তু উমার মায়ের কি হবে !

আমার সমস্ত পরিকল্পনা ভেস্তে গেল আমার দাদার জন্যে। যে-ভাবেই হোক হাজার পাঁচেক টাকা আমি জোগাড় করে ফেলতুম। বারোয়ারী শীতলাপুজোর চাঁদা তোলা যায়, একটা মানুষের বাঁচার অর্থ সংগ্রহ করা যাবে না ! দুর্গাপুজোয় লাখ লাখ টাকার খেলা হয়। কোথা থেকে আসে ! আমাদেরই পকেট থেকে। এই গঙ্গার ধারে বসে স্বীকার করতে লজ্জা নেই, উমাকে আমার ভীষণ ভাল লেগেছে। টবে আমি একটা ঝুমকো লতা

লাগিয়েছি। পাশে একটা গোল লাঠি গুঁজে দিয়েছিলুম। গাছটা সেই মসৃণ লাঠিটাকে জড়িয়ে কেমন সোহাগে লতিয়ে উঠেছে। উমাকে ঘিরে আমিও ওইরকম বেড়ে উঠতে পারি। আর একবার চেষ্টা করে দেখতে পারি, খুব শব্দ করে বাঁচা নয়, ফিস ফিস ফোয়ারার মতো স্নিগ্ধ জীবন স্বপ্ন। একদিন কিছুক্ষণের জন্যে দেখা, একটু হাতের ছোঁয়া, একটু চুলের গন্ধ, এক চিলতে ভ্রূভঙ্গ, হাঁটার নরম ছন্দ, দেহের ভরাট গড়ন। আমার মনের লেফাফা খুলে উঁকি মেরেছে নীল কাগজের চিঠি। এ যে হয়, মনের গড় যে হঠাৎ ভেঙে যেতে পারে গোলায় নয় সামান্য সুরে, আমার জানার সুযোগ হয়নি আগে।

গৌরাঙ্গদার পয়সা মিটিয়ে বেরিয়ে এলুম। কে জানে, এই হয়তো এই দোকানে শেষ চা খাওয়া। বড় শক্ত মানুষ। পরিবার পরিজনের কাছ থেকে পায়নি কিছুই। সমাজ, সে তো বড়ই কৃপণ। মরুভূমিতে গাছের কোনো পাতা হয় না। বিজ্ঞানী বললেন, পরিবেশের সঙ্গে লড়াই করে বাঁচতে গিয়ে পাতা হয়ে গেছে কাঁটা। গৌরাঙ্গ হয়েছে লোহা।

'কি চিকিৎসা করাচ্ছেন ?'

'চিকিৎসা করাব কেন ? আমি কি মেয়েছেলে ! রঙ ফর্সা হবার মলম মাখে মুখে। রঙ ফর্সা হয় না বোকা। ফর্সা রঙ হয়। ক্যানসার সারে ? সুযোগ ছাড়ব কেন ? জেল থেকে মুক্তির সুযোগ !' হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম অল্পক্ষণ। সত্যের মতো নির্মম গোলা আর কিছু নেই। আমি তো সেই কারণেই উমার মতো একটা নেশা ধরতে চাই। তা না হলে জীবন বড় ভয় দেখাবে। সত্যের আলো। কে বলেছে আলো ! সত্য অন্ধকার। সিমলায় এক সায়েব পুড়ে মরেছিল। ছেলেবেলায় একবারই আমরা বাবার সঙ্গে বাইরে বেড়াতে গিয়েছিলুম। তখন বাবার সুসময়। সেই সময় ঘটনাটা ঘটেছিল। ফায়ারপ্লেসে মিঠে আগুন। সায়েব মদ্যপান করছিলেন। মত্ত অবস্থায় সায়েব আগুন থেকে কাঠ তুলে পাইপ ধরিয়ে কার্পেটে ফেললেন ! তারপর মাঝরাতে আগুন। বাংলো পুড়ল, সায়েব পুড়লেন। প্রেম সেই মিঠে আগুন ? পোড়াতেও পারে ? জেনেশুনেই জ্বালাতে হয় ঘরের কোণে। উমা জীবনে আগুন ধরাতে পারে। পুড়িয়ে দিতে পারে। জানি, তবু মন চাইছে। আজ আমাকে টানছে। বড় পরিচ্ছন্ন সংসার। আজ আমি ভুলতে চাই। আমার পরিবারে বিরাট কিছু একটা ঘটার আগে আমি এমন একটা কিছু পেতে চাই যা আমাকে লড়াই করার শক্তি দেবে।

তিন ধাপ সিঁড়ি। দরজাটা বন্ধ। জানলা খোলা। অনেকটা দূরে একটা আলো জ্বলছে। সেই আলোয় সামনের সব কিছু সিল্যুয়েট। টেবিল, চেয়ার, খাট। প্রথমে মনে হল ফিরে যাই। আমি ঠিক অভ্যস্থ নই। এক মন বলছে ফিরে চল্। আর এক মন বলছে, তা কেন। দ্বিতীয় মনেরই জয় হল। কড়াটা খুব সাবধানে একবার নাড়লুম। উমার মা দরজা খুলে দিলেন। চিনতেও পারলেন।

'সব অন্ধকার করে রেখেছেন?'

'আর বাবা, যত আলো তত বিল। এসো, ভেতরে এসো। উমার জ্বর। ওই যে শুয়ে আছে।' উমার মা আলো জ্বালালেন। উমা চাদর মুড়ি দিয়ে খাটে শুয়ে আছে। তাড়াতাড়ি উঠে বসল। প্রসাদদা আপনি?'

'জ্বর হল?'

'আর বলবেন না, বৃষ্টিতে ভিজে কাপড় জামা কেচেছি। বসুন না প্রসাদদা।' সেই হাসি। যেন কতকালের পরিচিত আমি।

খাটের একপাশে বসলুম। এ বাড়িতে যত বনেদী আমলের জিনিস, আমাদের বাড়িতে তার কিছুই নেই। এত বড় আর বাহারী খাট আমাদের পরিবারে নেই। একটা বুকশেল্ফ রয়েছে যা ঘোরে। উমার বাবা, ঠাকুরদা দু'জনেই আইনজীবী ছিলেন। প্রচুর আইনের বই। সমস্ত কিছুরই বেশ পরিচর্যা হয়। কে আর করবে! উমাই করে। দেয়ালে উমা আর তার বাবার গ্রুপ ফটো। যৌবনে দু'জনকেই দেখতে বেশ ভালই ছিল। এখন ছবিটা যেন বেদনার ইঙ্গিতের মতো। গ্রাম্য দার্শনিকতা তৈরি করে—কিছুই থাকে না, থাকবেও না। অকারণে ধরে রাখার চেষ্টা, মুঠোয় ধরা বালির মতো।

উমা বললে, 'প্রসাদদা, কি হয়েছে আপনার? মন খারাপ! এমন বিমর্ষ দেখাচ্ছে! কি খাবেন?'

'তুমি বোসো তো! কত জ্বর!'

খুব ইচ্ছে করছে, ছোট্ট কপালে হাত রেখে উত্তাপ অনুভব করি। গোল হাতের কবজিতে আঙুল রেখে নাড়ি কেমন চলছে দেখি। ফর্সামুখ লালচে হয়ে আছে।

চোখ কুঁচকে, সারা মুখে হাসি ছড়িয়ে বললে, 'মেপে দেখিনি। একটু আগে বেশ ঘোর লেগেছিল। এখন ঘাম দিচ্ছে।'

উমার মা পাশের ঘরে চলে গেছেন। মৃদু গলা শুনতে পাচ্ছি, বোধহয় শয্যাশায়ী স্বামীকে বলছেন, 'ছটফট করে কিছু হবে? যা হবার ঠিকই হবে!

অত ভেবো না! জানবে মানুষের ওপর আর একজন আছেন। তাঁর বিচার বড় বিচার।'

আমি আর সামলাতে পারলুম না নিজেকে। উঠে গিয়ে, উমার কপালে হাত রাখলুম। আমার বাঁ হাত উমার মাথার পেছনে, ডান হাত কপালে। বেশ গরম। দুই তো হবেই। উমার জ্বরতপ্ত মাথা হেলে পড়ল আমার বুকে।

উমা বললে, 'আঃ, কি আরাম। কপালটা যন্ত্রণায় ছিঁড়ে যাচ্ছে। আপনার হাতটা কি সুন্দর ঠাণ্ডা প্রসাদদা। ভীষণ আরাম লাগছে।'

ও-ঘরে একটা কিছু সরাবার শব্দ হল। আমি তাড়াতাড়ি সরে এলুম। মন কত সহজে নিজেকে অপরাধী ভাবে! কর্মের পেছনে বাসনা থাকলে মানুষের বোধহয় এইরকমই ভয় আসে। ভয় তাড়া করে। সেই ছেলেবেলা থেকেই এমন একটা সংস্কার তৈরি করে দেওয়া হয়েছে মনে! এই সংসারে স্বাভাবিক সব কিছুই পাপ। এর মধ্যে কিছু পাপ, কিছু মহাপাপ। মহাপাপের উৎস হল পুরুষ ও নারী। কাছাকাছি হয়েছ কি, সংসারের অদৃশ্য নীতিশালে অ্যালার্ম বেল বেজে উঠল। আমি একদিন দু'হাত দিয়ে আমার বউদিকে জড়িয়ে ধরেছিলুম পেছন দিক থেকে। মনে কোনো পাপ ছিল না আমার। বুল যে মন নিয়ে তার মাকে জড়িয়ে ধরে, আমিও ঠিক সেই মন নিয়েই আমার ছেলেমানুষী, আমার আবেগ, আমার আনন্দ, আত্মীয়তা, নির্ভরতা প্রকাশ করতে চেয়েছিলুম। পাপ বসেছিল পাশের বাড়ির দোতলার জানালায়। আমি অনুমান করতে পারি, প্রচার কিভাবে হল কেমন ভাবে হল! আমি তো জর্দার লাইনে আছি। ওই লাইনের জায়েন্ট হরিরাম আমাকে মাঝে মাঝে শেখায়, প্রসাদজী, কাগজ, টিভি, বিবিধভারতীর বিজ্ঞাপনের চেয়েও পাওয়ারফুল লিপ পাবলিসিটি। বাঙালির সবচেয়ে বড় প্রমোদ উপকরণ হল, পরচর্চা। পরের চর্চা কেমন? লোকটাকে ধরে আলকাতরা মাখাও, হোলি হায় হোলি, ছাররা রারা, ছাররা রারা। একটা জিনিস বাঙালি কিছুতেই সহ্য করতে পারে না অন্যের সুখ। আর একজনের ভাল হয়ে গেল! সর্বনাশ হয়ে গেল। পয়সা হয়েছে? নির্ঘাত চোর। অবস্থা পড়ে গেছে? নির্ঘাত চরিত্রহীন, মাতাল, মেয়েছেলের ব্যামো আছে। এগোলেও নির্বংশের ব্যাটা, পেছলেও নির্বংশের ব্যাটা। আমার কেসটায় কি হয়েছে, আমি জানি। ক-দেবী দুপুরে খ-দেবীকে, বললেন, খুব চলছে, দেওর বৌদি। খ-দেবী সেক্সের গন্ধ পেলেন। ইয়া দেবী সর্বভূতেষু সেক্সরূপেণ সংস্থিতা। উপবাসী মা গো! একালের রমণীরা একটি কথা আজকাল ভারী সুন্দর বলেন, সুরে বলেন। শব্দটা বেরিয়ে আসে

টাগরার কাছ থেকে, যেখানে ইলিশ মাছের কাঁটা ফোটে—ও তাআই! যেন ঝাউয়ের পাতায় বাতাস বইল। ক-দেবী অমনি নাকের ওপর বিউটি-ভাঁজ খেলিয়ে, ঠোঁট দুটোকে নাড়ু খাওয়ার মতো করে বলবেন, 'ব্যভিচার, ব্যভিচার। মানুষ আজকাল ভাই কুত্তারও অধম, কুত্তারও অধম। তাদের তবু একটা সময়জ্ঞান আছে।'

খ-দেবী এইবার তাই তাই ছেড়ে আলোচনার অন্দরমহলে ঢুকবেন, 'বুড়ো দামড়া বিয়ে করলেই তো পারে!'

'অপরের কাঁধে বন্দুক রেখে যদি চলে যায়, এর চেয়ে মজার আর কি আছে! দাদাটা তো হাবাগোবা নাম্বার ওয়ান। চোখে ঠুলি পরে বসে আছে। দেখেও দেখে না। বৃন্দাবন লীলা চলছে।'

'মেয়েটাই বা কেমন? দু'ছেলের মা!'

'আরে এ-কালের মেয়েগুলোই তো সর্বনেশে। যত নষ্টের মূল। মেয়েদের সায় না থাকলে ছেলেরা সাহস পায়! আমি যদি মুড়ো ঝ্যাঁটা ধরি কার বাপের ক্ষমতা আছে আমাকে জড়িয়ে ধরে!'

'জড়িয়ে ধরেছিল? তুমি দেখলে? তারপর কি করল?'

খ-দেবী আদিরসের স্বাদ পেলেন। দক্ষিণী সিনেমা। গরম নিঃশ্বাস।

ক-দেবী, 'তারপর আর কি! দু'জনে ঘরে ঢুকে গেল। ছেলেটা তো অবিকল কাকার মতো দেখতে হয়েছে।'

'ও মা তাআই!'

এই খ-দেবী রাতে খ-বাবুকে পাশবালিশ করে খবরটা জানালেন। খ-বাবু সেলুনে চুল কাটতে কাটতে ঘ-বাবুকে বললেন। ঘ-বাবু বললেন ঘ-দেবীকে। ঘ-দেবী বললেন, বাড়ির কাজের মেয়েটিকে, 'কিছু খবর রাখো পাড়ায় কি হচ্ছেটচ্ছে।'

ল্যাংটার নেই বাটপাড়ের ভয়। আমি খুব একটা গ্রাহ্য করি না। আমার লজিক সুনাম কারোরই নেই। সকলেরই বদনাম। অন্যের চোখে সকলেই ঝলঝলে, খলখলে। রাজীব ডাকাত, জ্যোতি চোর। কান দিয়েছ কি মরেছ। অন্যের সঙ্গে ঘড়ি মেলাতে গিয়ে আমি একবার বেনারস এক্সপ্রেস ফেল করেছিলুম। স্লো করলুম, ফাস্ট করলুম, ফাস্ট করলুম, স্লো করলুম। প্ল্যাটফর্ম খালি। এক্সপ্রেস চলা গিয়া।

এত বিচারের পরেও কোথাও যেন একটা খিঁচ থেকে যায়। অপরাধ নয় তবু একটা অপরাধবোধ। শব্দ হল; কিন্তু ঘরে কেউ এল না। খাটের

একপাশে পা ঝুলিয়ে বসে আছি। ঘরের আলোটা উমার মুখে এসে পড়েছে। গভীর রাতে আলোর পাশে একা একটা পোকাকে উড়তে দেখলে, মাঝ রাতের নির্জন স্টেশান দেখলে মনে যে-ভাব আসে, আমার সেইরকম একটা ভাব এল। কোথাও না কোথাও আমাদের জন্যে কেউ না কেউ আছে, আমরা ধরতে পারি না। একা একা জীবন কাটাই। প্রতিটি হাত ধরার জন্যে আর একটা হাত আছে।

উমা জড়োসড়ো হয়ে বসে বললে, 'কি এত ভাবছেন প্রসাদদা? কিছু খাবেন?'

'তুমি এই অবস্থায় খাওয়ার কথা ভাবতে পারলে?'

'আজ যে কি করে রান্না করেছি? মায়ের অবস্থা তো সাঙ্ঘাতিক। তলপেটে এতখানি একটা চাকার মতো হয়ে আছে। বেশ বড় মাপের টিউমার। জানেন প্রসাদদা আগে অনেক কিছু ভাবতুম। এখন আর একদম ভাবি না। যা হবার তা হবে। যখন হবে তখন দেখা যাবে। আগের মতো আর দুঃখ-কষ্টও হয় না। চোখে জলও আসে না। কোনো অভিযোগও নেই। যে যা করছে, সেইটাই ঠিক।'

উমা বলছে কান্না শুকিয়ে গেছে। জানে না, কান্নাটা হাসি হয়ে গেছে।

'কি ওষুধ পড়েছে?'

'ধৈর্য।'

'একটু জানতে ইচ্ছে করছে।'

উমা চোখ কুঁচকে হাসল। জ্বরলাগা মুখে হাসিটায় অন্য একধরনের মাধুর্য পাওয়া গেল। বিষণ্ণ আকাশের নীচে সাদা পালতোলা নৌকোর মতো। ভেসে চলে গেল।

'খুব সহজ ওষুধ প্রসাদদা, এই ধৈর্য। সব রোগ সেরে যায়। অপেক্ষা। ডাক্তার ডাকলেই পঞ্চাশ। ওষুধ একশো। গুচ্ছের ওষুধ মানে এক রোগ সারিয়ে আর এক রোগ ধরানো। ইনফ্লুয়েঞ্জা, ডেঙ্গু, ক্যালকাটা ফিভার, ওষুধ খেলেও সাতদিন, না খেলেও সাতদিন। সহ্য করতে পারলে কোনো ঝামেলা নেই। অসুখ হল কুকুরের জাত। নাই দিলেই মাথায় চড়ে বসবে। চা খাবেন প্রসাদদা? আমার খুব খেতে ইচ্ছে করছে।'

'কপালে হাত রেখে মনে হল, তোমার প্রায় দুইয়ের ওপর জ্বর। আমাকে একটা কেটলি দাও, আমি দাঁড়িয়ে থেকে স্পেশাল চা তৈরি করিয়ে আনছি।'

'আমি করি না প্রসাদদা। দোকানের চা কি বাড়ির মতো হবে?'

'খুব হবে। দাও তো তুমি। চায়ের সঙ্গে আর কি খাবে?'

'বেশ ঝাল ঝাল চানাচুর।'

'না, ওটা কুপথ্য। বিস্কুট খাও'।

'মুখে যে কিছুই ভাল লাগছে না।'

'সল্টেড! রাত্তিরে কি খাবে?'

'কিছু না। খেলেই জ্বর বাড়বে?'

'একেবারে খালি পেট? সন্দেশ খাবে?'

'না-না।'

উমা এমনভাবে না-না বললে, যেন আমি মদ খেতে বলেছি। কেটলিটা হাতে দিতে দিতে বললে, 'প্রসাদদা সন্দেশ একা একা খেতে পারবো না। অনেক সন্দেশ লেগে যাবে। আপনি বরং শুকনো মুড়ি, বেশ ফোলা ফোলা, মানে মোটা মুড়ি আর এক ডুমো আদা কিনে আনুন। জ্বরের মুখে বেশ লাগবে।'

'বাবা-মা কি খাবেন? আচ্ছা, তোমার ছোট ভাই কোথায়? সেদিনেও দেখা হল না, আজও নেই।'

'দিনের বেলায় এলে দেখা পাবেন প্রসাদদা। সে একটা ছোট্ট চাকরি করে, সব সময় নাইট ডিউটি।'

'কি চাকরি? রোজ নাইট!'

উমা মুখ নিচু করে রইল! উত্তর দিচ্ছে না। আমার সন্দেহ নাড়া খেল। চুরি, ডাকাতি, ওয়াগন ব্রেকিং! উমা মুখ তুলে বললে, 'একটা হাসপাতালের ওয়ার্ডবয়। পাকা চাকরি নয়। মাঝে মাঝে বসিয়ে দেয়। খুব সামান্যই দেয়। কোনোভাবে আমাদের চলছে প্রসাদদা। আপনার কাছে একটাই অনুরোধ প্রসাদদা, কখনো দাতার ভূমিকা নিয়ে আমাদের দিকে পয়সার হাত বাড়িয়ে দেবেন না। তাহলে কিন্তু আপনার সঙ্গে আমার আর বন্ধুত্ব থাকবে না। আপনাকে কিন্তু আগেই সাবধান করে দিচ্ছি।'

উমার চোখমুখের চেহারা পাল্টে গেল। যেন জ্বলন্ত কয়লা। একটু অস্বস্তিতে পড়ে গেলুম।

'হঠাৎ, এই কথা বললে উমা?'

'রাগ করলেন প্রসাদদা?'

'রাগ নয় উমা। একটু যেন ভয় পেয়ে গেলুম।'

'তিনটে ঘটনা আছে প্রসাদদা। ঘরপোড়া গরু তো, সিঁদুরে মেঘ দেখলে

ভয় পাই।'

'আচ্ছা উমা, এই চা, মুড়ি, আদা, এটা তো আমি আনতে পারি?'

উমার মুখে আবার সেই চোখ কোঁচকানো হাসি। উমা বললে, 'দুষ্টু ছেলে!'

রাত আটটায় রাস্তায় নেমে এলুম। কত সহজেই ঘোর লেগে যায়! কতকাল কেউ আমাকে ভালবাসার চোখে দুষ্টু ছেলে বলেনি। মা হয়তো বলতেন। সেই বলা আর এই বলার তফাত আছে। শুকনো মেঘের গুড়ুগুড়ু, আর জলভরা মেঘের গুড়ুগুড়ু। শুকনো বাতাস আর ভিজে বাতাস! মনের এই অবস্থায় কোথা থেকে পাখির মতো কবিতা উড়ে আসে। কবিতারা যেন মনের মিনারের প্রেয়সী। বাস্তব থেকে মন সরলে তবেই সে এসে হাত ধরে! কানে কানে কথা বলে। দমকা বাতাস বইছে। পশ্চিম থেকে পুবে। যেন কোনো আরব ঘোড়সওয়ার! সাদা জোব্বা ফড়ফড় উড়িয়ে চলেছে। এই কি সেই রাত! বিয়ে আছে আজ কোথাও দূরে। নিঃসঙ্গ দরবেশের মতো ভেসে আসছে সানাইয়ের সুর। ইমন বাজছে।

গভীর হাওয়ার রাত ছিল কাল—অসংখ্য নক্ষত্রের রাত;
সারা রাত বিস্তীর্ণ হাওয়া আমার মশারিতে খেলেছে;
মশারিটা ফুলে উঠেছে কখনো মৌশুমী সমুদ্রের পেটের মতো।

জীবনে এত ভালবেসে এত সামান্য জিনিস কখনো কিনিনি। ফুলোফুলো মুড়ি। তিন দোকান ঘুরে অবশেষে পেলুম। আবার নুন কম। আদা কেনা হল। এইবার চা। সবই হল। মনে হচ্ছে নিজের সংসার স্টার্ট করে দিয়েছি, পরের কাছ থেকে সানাইয়ের সুর ধার করে। পরিচিত এক মক্কেল আমার এই ঠোঙ্গা হাতে, কেটলিঝোলা অবস্থা দেখে একান্ত প্রশ্নটি করতে ভুললে না, 'আজকাল বাড়ির চা কি বন্ধ হয়ে গেছে, না আলাদা হয়ে গেছো?'

দু'ভাইয়ের ভাব ভালবাসা অনেকেরই তেমন পছন্দ হয় না। সত্যই তো, শাস্ত্রবিরোধী কাজ। উত্তর না দিলে শত্রু হয়ে যাবে। আজকাল শত্রু হওয়া মানে গোটা একটা দল শত্রু হয়ে যাবে। কারণ? কারণটা তো বুঝতে হবে। হাতির যেমন শুঁড়, বিছের যেমন পা, সেইরকম এক একটি মানুষ আর একক মানুষ নয়। দলের দাড়া। সে-সব অনেক কথা। সমাজ-ঐতিহাসিকরা লিখবেন কোনো দিন। কি হয়েছিল নয়ের দশকে! মানুষ কি হয়ে গিয়েছিল!

ভেতরটা আগুনের মতো গরম বাইরেটা ভীষণ শীতল। আইসক্রিম না কি এইরকমই এক পদার্থ! আইসক্রিম হয়ে উত্তর দিলুম, 'বাড়িতে একটু জ্বরজারি যাচ্ছে।'

লোকটি ক্রিমিন্যাল সাইডের ডাকসাইটে উকিল হতে পারত। মুচকি হেসে বললে, 'পাড়া ছেড়ে বেপাড়ার দোকানে ? বিশুর চায়ের দোকান কি হল। তোমার তো যেতে যেতেই হট টি কোল্ড হয়ে যাবে।'

হঠাৎ মনে হল, আমার এত গোপনীয়তা কি প্রয়োজন ? বলে দিলেই তো হয়। তারপর মনে হল, আমার হয়তো কিছু নয় উমাকে নিয়ে টানাটানি হবে। ক্ষীরের মতো হেসে বললুম, 'পাড়ার দোকানে এই সময় ছোট চা আর পাওয়া যায় না, চাইলে বিরক্ত হয়। এখন বড় চায়ের সময়। সাট্টার বুকিরা এসে গেছে। আমাদের মতো অ্যান্টিসোস্যালদের ঠিক পছন্দ করে না।'

লোকটা হো হো করে হাসল। পরনে মেয়েদের শাড়ির মতো লুঙ্গি। হাফ হাতা পাঞ্জাবি। যখন যে-দল গদিতে তখন সেই দলটাই এর দল। নির্বাচনের আগে একটু অস্বস্তিতে পড়েছিল। সিদ্ধার্থশঙ্কর যদি গণেশ উল্টে দেন। নির্বাচন হয়ে যাওয়ার পর কি গলা, ওনলি পার্টি, ওনলি সল্যুসান। এর হম্বিতম্বিতে পার্টির আসল ক্যাডাররা ঘাবড়ে যায় ! এ আবার কোন গ্রুপের।

আমাকে একটু ঘুরপথে উমাদের বাড়িতে আসতে হল। সাবধানের মার নেই।

'কত মুড়ি এনেছেন প্রসাদদা ?'

কৌটোয় তুলে রাখো। অনেক করে খুঁজে পেয়েছি। কাল-পরশু তোমার চলে যাবে।'

'কত চা এনেছেন প্রসাদদা ?'

বাবা-মা খাবেন না !'

'সকালে একবার। মায়ের তো ওই পেটের অবস্থা। বাবাকে চামচ করে খাওয়াতে হয়। প্রসাদদা আমাদের বাড়িতে কেউ আসে না। কোনো সুখ নেই। এ এক চোরাবালি। যে আসবে সে-ই ডুববে। আপনি এখনো ঠিক বুঝতে পারছেন না।'

উমা কাপে চা ঢেলে আমার দিকে এগিয়ে এল। কাপটা ধরে নিলুম। হাতে হাত ঠেকল। চায়ের কাপের মতোই গরম। জ্বর বাড়ছে। উমা বসল। উমার ভুলটা ভাঙিয়ে দেওয়া উচিত।

'উমা তুমি আমাকে চেনো ?'

'একটু একটু।'

'শুনি। কেমন একটু।'

'আপনার বাবা আর আমার বাবা সহপাঠী ছিলেন। তখন আমরা একটা

ভাড়া বাড়িতে থাকতুম আপনাদের পাড়াতেই। ছেলেবেলায় আপনি আমাদের বাড়িতে আসতেন।'

'বাকিটা আমি বলি। তোমার বাবা হলেন নামকরা প্লিডার। আমার বাবা হলেন মার্চেন্ট অফিসের কেরানী।'

'এরপর আমি বলি। আমাদের অবস্থা ফিরতে লাগল। বাবার প্র্যাকটিস যত জমল, পুরনো বন্ধুবান্ধব কমল। জমি কেনা হল। বিরাট বাড়ির প্ল্যান হল। হঠাৎ বাবার প্র্যাকটিস কমল ; কারণ জমিজমার মামলা জমিদারি-বিলোপ আইনের পর ভীষণ কমে গেল।'

'এইবার আমি বলি। তোমরা যত বড়লোক হলে, আমরা তেমন হতে পারলুম না। মধ্যমলোক হয়েই রইলুম। যেহেতু তোমরা বড়লোক হলে সেই হেতু আমাদের আর খবর রাখলে না।'

'আবার আমি। মানুষের অবস্থা হল চাকার স্পোক। এইযে ওপরে পর মুহূর্তেই সে নীচে। বাবা পয়সাটা খুব চিনেছিল। পয়সাও বাবাকে চিনেছিল। বেশি পরিচয়ে ঘৃণা বাড়ে ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়। পয়সা যত ছেড়ে যেতে চায় বাবা তত আঁকড়ে ধরতে চায়। সেই লতা মঙ্গেশকরের গান, না যেয়ো না, রজনী এখনো বাকি। চির রজনীতে ফেলে দিয়ে পয়সা পালাল। শুরু হল বাবার উষ্ণবৃত্তি। হলেন দলিল লেখার উকিল। ধার-দেনা শুরু হল। দুঃখের কাঁদুনি গেয়ে ভিক্ষে শুরু হল।'

'আমার টার্ন। বাবার সংসার বড় হচ্ছে, আয় বড় হচ্ছে না। সবকিছুর দাম বাড়ছে। বাবা আগে ছোট ছোট কবিতা লিখতেন, সমস্যার ঘনঘটা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কবিতার আকার বড় হতে লাগল। সব কবিতাই বুকফাটা আর্তনাদের মতো। বিশাল অভিযোগ। ভগবানের কাছে নালিশ। চা আর সিগারেট, সিগারেট আর চা। মাঝ দরিয়ায় নৌকো ফেলে মাঝি হাওয়া। আমরা অসহায় যাত্রী। আজও টলমল করছি। নদীর ঢেউ আগের চেয়েও উত্তাল তেমনি তুফান। দাদা কোনো রকমে লেংচে লেংচে বেরিয়ে এল। আমি আজও না ঘরকা, না ঘাটকা।'

'এইবার কিন্তু আমার পালা, টাকা টাকা করতে করতে বাবার স্ট্রোক। সবাই বললে ভয় কি মশাই ! ছেলে তো মানুষ হয়েছে। এইবার আপনার বড় ছেলে রোশন চৌকি বসাবে। বাবা অমনি জিভ জড়ানো গলায় গদগদ হয়ে বলত, সবই তাঁর আশীর্বাদ। গর্বে পড়ে যাওয়া শরীরও একটু টানটান হত। বাবা-মা আগে না প্রেম আগে। প্রেম মহান। দাদা পটাস করে বিয়ে করে বসল।

রেজেস্ট্রি ম্যারেজ। একেবারে হাত ধরে জোড়ে চলে এল।'

'আমার পালা, তোমারটা এক লাইনের কাহিনী, আমারটা একটু অন্য লাইনের। প্রচণ্ড অভাবেও বেশ একটা সুখ হল আমাদের। সুখ পেটে নেই সুখের বাসস্থান মন। আমার দাদা বাবার কাছ থেকে আকাশের মতো একটা মন পেয়েছিল, আর কোথা থেকে একটা জগৎ ছাড়া বউদি এল। দু' রকমের রান্না আছে। এক খুব মশলাটশলা দেওয়া মোগলাই টাইপের, যাকে বলে রিচ। আর একটা কম মশলা, কম তেল, হাল্কা ধরনের। প্রথমটা ক্ষতিকারক, দ্বিতীয়টা স্বাস্থ্যকর। সুখও দু'রকম। রিচ সুখ, লাইট স্যুপ টাইপের সুখ। বউদি আমাদের অভাবটাকেই কায়দা করে সুখের স্যুপ করে দিলে। মশলা হল হাসি। হাসির ঢাকনা দিয়ে দুঃখটাকে নাও, দেখো সুখ কাকে বলে। এইবার আমার নটে গাছ মুড়োবে। পরমানন্দের কবিতায় বলি। কাব্য আর কাবাব দুটোই কা আর ব-এর খেলা :

'সময় যেন শাঁখের করাত,
কখনো দিন কখনো রাত
হাত-পা নেই নটেশ্বর
রঙ্গ করে সবার ঘর,
হাঁটে সকল হাটে
শতভুজা সুখ-দুঃখের
প্রতি অঙ্গ ছাঁটে।

'গাছ কাটা কাঁচি দিয়ে ছেঁটে দিলে গাছ। শুনলে তুমি আমাকে পাগল বলবে, ভীষণ মন খারাপ নিয়ে তোমার কাছে এসেছি। মনে হল উমার কাছে যাই। একজনের কাছে বলি, খেলাঘর ভাঙার কথা। তুমি হয় তো ভাবছ, বাবা! একদিনের পরিচয়ে লোকটার তো খুব দুঃসাহস।'

উমার সেই হাসি। অদ্ভুত একটা কথা বললে, 'বেশি পাকা! বলুন। কি হয়েছে প্রসাদদা?'

'এইবার তুমি একটু শুয়ে পড়। অনেকক্ষণ ঠায় বসে আছ।'

'শুলেই আমার হাত, পা, কোমর সব ছিঁড়ে যাচ্ছে। প্রসাদদা। এই বসে আছি, আপনার কথা শুনছি, এ অনেক ভাল।'

'উমা, আমার দাদার ডানপাটা কেটে বাদ দিতে হবে।'

উমা কেমন যেন হতভম্ব হয়ে গেল। আমি বোঝার চেষ্টা করলুম, উমা অভিনয় করছে, না সত্যই তার মন স্পর্শ করেছে। একদিন বাসে দুই

ভদ্রলোকের বাক্যালাপ শুনতে শুনতে আসছিলুম। আমি বসেছিলুম তাঁদের পেছনের আসনে। আলোচনাটা হচ্ছিল এই রকম :

ক ॥ অমরনাথ ঘুরে এলুম
খ ॥ হে হে, খুব ভাল
ক ॥ মেয়েটার বিয়ে দিয়ে দিলুম
খ ॥ হে হে, খুব ভাল
ক ॥ ছেলেটা বিলেত গেল
খ ॥ হে হে খুব ভাল
ক ॥ মা হঠাৎ মারা গেলেন
খ ॥ হে হে খুব ভাল

ভবেশচন্দ্র পাবলিক লাইব্রেরী
স্থাপিত-১৮৯৭
খুলনা

সেই থেকে আমি ঠিক করেছিলুম, নিজের কোনো কথা কারোকে বলব না। কেউ কারোর কথা শোনে না। শোনার ভদ্রতার মধ্যে অসীম উদাসীনতা। বেমক্কা ধরা পড়ে যায়।

উমা খুব উদ্বেগ নিয়ে বললে, 'প্রসাদদা কি হবে। সংসারটা যে ভেসে যাবে। যারা ভাল হয় তাদের সুখ সহ্য হয় না। বউদির কি হবে!'

'আমার ডাক্তার বন্ধু বলছিল, পৃথিবীটা এখন চতুষ্পদের, দ্বিপদ কোনোরকমে গা বাঁচিয়ে চলে, একপদের অবস্থাটা তাহলে একবার ভাব। তোদের নেগলিজেন্সে একটা মানুষ পা হারাল।'

'তার মানে আপনাদের অবহেলা ছিল?'

'ঠিক অবহেলা নয়, অদ্ভুত এক ধরনের বিশ্বাস। আমাদের খারাপ কিছু হতে পারে না। কি বোকা! উল্টোটা ভাবা উচিত ছিল। ভাল কেন হবে। দুঃখ বললে, আমাকে ছেড়ে যাবি কোথায়! সুখের কোলে চড়তে গিয়েছিলে? আমি যে তোর আসল মা—মমতার ফাঁদে মৃদু, তাহাতে পড়েছ জাদু এ মাতাকে ছেড়ে আর কোথা যাবে বল ॥'

তোর ঘরে মামলা ঢুকুক, তোর ঘরে অসুখ ঢুকুক। এর চেয়ে সাঙ্ঘাতিক অভিশাপ আর কিছুই নেই। উমাদের বাড়ির রাতটাকে যেন আরো বেশি অন্ধকার মনে হচ্ছে। পাশের ঘরে দুটি প্রাণী যেন স্টেশানের ওয়েটিংরুমের দুই যাত্রী। ট্রেন আসছে, কখন ইন করবে জানা নেই। এই স্টেশানের স্টেশানমাস্টারকে দেখা যায় না। অদৃশ্য এক মহাট্রেনের পরিচালক তিনি।

উমা অকারণে কোনো সান্ত্বনার ফাঁকা বুলি আওড়াল না। উমা বললে, 'অত হতাশ হচ্ছেন কেন প্রসাদদা! ভাগ্যকে মানতে হবে। নতুন কায়দায়

ROMAN 7. P.C. Ray Road Khulna

হাঁটাচলা অভ্যাস করতে হবে। মা বলে, শরীরের নাম মহাশয় যা সওয়াবে তাই সয়! দাদাকে এখন প্রচণ্ড সাহস দিতে হবে। একেবারে ঘিরে রাখতে হবে।'

'কাণ্ডটা দেখো, ভাবলুম এক হয়ে গেল আর এক। কিছু টাকা যোগাড় করে ভেবেছিলুম তোমার মায়ের অপারেশানটা করাব। তোমার বাবার তো কিছু করা যাবে না। করার নেই কিছু। এখন দুটো বড় অপারেশান একসঙ্গে। কিভাবে ম্যানেজ করা যাবে! আমার আঙুলে এই যে আংটি। এইটার দাম কমসে কম সাত হাজার। ক্যাশ আছে দুই। নয় হল। দাদার প্রভিডেন্ট ফান্ড ভাঙব না। মেয়ের বিয়ে, ছেলের এডুকেশান।'

'তা হলে যে-ভাবেই হোক ম্যানেজ করুন।'

'আরো একটা ব্যাপার আছে, অপারেশানের পর দাদা হয় তো বসে যাবে। তখন সংসারটাকেও একা টানতে হবে। জর্দার ফেরিঅলা আমি। কতইবা আমার রোজগার! কি মজা!' উমা সেই চোখ কোঁচকানো হাসি মেখে বললে, 'কি মজা প্রসাদদা?'

'আমরা কেন কিছু পারি না উমা?'

'সেইটাই তো আইন। একটা গান শোনেননি, কোই জিতা কোই হারা। বড়ে মজা আয়া। শুনো চম্পা।'

'তুমি গান ভালবাসো?'

'আমার খুব ইচ্ছে করে, আমার বেশ একটা ছোট্ট ওয়াকম্যান থাকত। কানে লাগিয়ে ওই গানটা কেবল শুনতুম, এমন একটা ঝিনুক খুঁজে পেলাম না যাতে মুক্তো আছে, এমন একটা মানুষ খুঁজে পেলাম না যার মনও আছে।'

'আচ্ছা, আমি তোমাকে ফ্যান্সি-মার্কেট থেকে কিনে এনে দেব।'

'কেন প্রসাদদা?'

'তোমাকে ভালবাসি বলে।'

উমার মুখটা কেমন যেন হয়ে গেল। একটা বিষণ্ণতা, সন্দেহ, আতঙ্ক! সামান্য একটা শব্দ, ভালবাসা, তার কি ভয়ঙ্কর প্রতিক্রিয়া! শব্দটা কি মৃত মানুষের মতো পচে, গলে গেছে! নাকে রুমাল দিতে হচ্ছে!

'ভয় পেলে উমা?'

'প্রসাদদা, সেই যে তখন বলছিলুম, আগে আসে টাকা, পেছনে আসে দুটো হাত, মোটা, বড় বড় লোম, বড় বড় নখ। আমার জীবনে তিনবার এই ঘটনা ঘটে গেছে। সহানুভূতিকে ওজন করা হয়েছে টাকায়। পরোপকারের মুখোশ খুলে তেড়ে এসেছে জন্তু। আপনাকে ওদেরই একজন ভাবতে আমার কষ্ট হবে

প্রসাদদা।'

'কেন?'

'লম্পট বড়লোক সহ্য করা যায়। ব্যাঙের পিঠেই গুটি মানায়। দায়িত্বশীল মধ্যবিত্ত লম্পট হলে অসহ্য লাগে।'

'আমি যদি সত্যি সত্যি তোমাকে ভালবেসে ফেলি, সে আমার দোষ, না তোমার?'

'আমার দোষ কেন?'

'নিজেকে চেনো? নিজেকে দেখতে পাও? চোখের মস্ত বড় ত্রুটিটা কি জানো, চোখ অন্যকে দেখতে পায়, নিজেকে দেখতে পায় না। তার জন্যে আয়নার প্রয়োজন। সেই আয়না হল অন্যের অনুভূতি। তোমার মায়া আমাকে জড়িয়ে ধরেছে। এর মধ্যে শরীরফরীর নেই উমা। তোমার আকর্ষণ যে কত প্রবল তোমার জানা নেই। চুম্বকের আকর্ষণ বুঝতে হলে লোহা হতে হয়। পেতল, নিকেল, সোনা, রুপো হলে হবে না। কেন সোনা তো অনেক দামি! চুম্বক কিন্তু টানে না। আমি সেই লোহা। কোনো দাম নেই। গরীব, অশিক্ষিত, জর্দাঅলা, চালচুলোর ঠিক নেই, ব্লু ব্লাড নেই শরীরে। বোকা এক রোমান্টিক। শুধু স্বপ্ন দেখি। দেহ বড় হয়েছে, মন বড় হয়নি, শিশু হয়েই আছে, অতীতের সবুজ মাঠে সদ্যোজাত সাদা বাছুরের মতো লাফাচ্ছে। আমি দেখতে পাই, দেখতে পাই তোমার চোখ, তোমার হাসি, দেখতে পাই অন্ধকার পথে তোমার অসহায় পিতাকে, দেখতে পাই অন্ধকার ঘরে তোমার মাকে। তিন ছেলের মা। তোমার চেয়েও কম বয়সে সংসার শুরু করেছিলেন। সুন্দরী একটি মেয়ে। খোঁপা, কাজল, টিপ, ঝকঝকে দাঁতের হাসি। নীল স্বপ্ন। ভাঙছে, সব ভাঙছে, স্বপ্নের পলেস্তারা চুরচুর করে ঝরে পড়ছে। আমি দেখতে পাই। ভেতরের পাগল চিৎকার করে, যা, যা, ছুটে যা, পৃথিবীকে নয়, একটা মানুষের নিভৃত একটা স্বপ্নকে বাঁচা। নিজেরও তো স্বপ্ন থাকে উমা। পাশে একজনকে চায়, তার শরীরের নাম যাই হোক আসল নাম ভালবাসা। আমি একটা দাবার ছক দেখতে পাই। একদিকে সাদা রাজা-রানি, আর একদিকে কালো রাজা-রানি। একটা সুখ একটা দুঃখ মাঝখানে কুরুক্ষেত্র। দুঃখেরও রাজা-রানি হয় উমা। দুঃখেরও রাজত্ব আছে। দেখেছ নেতাদের মতো লেকচার দিচ্ছি।'

উমা হঠাৎ ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল।

মন জাদুকর রাজার পোশাক পরে সুখের ইন্দ্রজাল দেখিয়ে এইভাবেই সরে

যায়। পড়ে থাকে অন্ধকার মঞ্চ। সেই অন্ধকারে দুঃখ, ধ্বংস, অনিশ্চয়তা দিয়ে ঢালাই করা কালো সিংহাসনে বসে আছে অন্ধরাজা ধৃতরাষ্ট্র। একপাশে দুর্যোধন, দুঃশাসন, দুই দুষ্প্রবৃত্তি, দুটো নীচ আকাঙ্ক্ষা। ভাগ্যলক্ষ্মী গান্ধারী অন্ধ না হয়েও অন্ধ। আমার শিক্ষক বলতেন—প্ল্যান্ট এ ট্রি, ইট উইল গিভ ইউ মেনি থিংগস, প্ল্যান্ট এ সান হি উইল টেক অ্যাওয়ে এভরি থিং। উমার দাদা কেন, আরো অনেক এই রকম দাদা আছে যারা খুব উঁচু মিনারের মতো ফ্ল্যাটে ঠ্যাং-এর ওপর ঠ্যাং তুলে বিলিতি বই পড়ছে। পায়ের তলায় নরম কার্পেট। লোমঅলা আদুরে কুকুর। টিভির রঙীন পর্দায় চলেছে, মহাসমস্যার সমাধান। দেয়ালে সর্বাধুনিক কোন্ রং লাগালে সিল্কের পাঞ্জাবির এফেক্ট আসবে। চুলে আপাতত কোন্ শ্যাম্পু, রেশমের চামরের মতো চুল দুলবে এদিকে, ওদিকে। অন্য কোনো সমস্যাই নেই পৃথিবীতে। সমস্যা মাত্র গোটাকতক, চিরুনি চালালেই চুল উঠে আসছে, সুন্দরীর গালে ভ্রমরের মতো বসে আছে ব্রণ, চোখের কোলে একটু কালো দাগ পড়ছে কি? দূর থেকে দেখলে মনে হবে, আহা কি ঝলমলে, আলোকিত মানবের আবাসস্থল! কলিংবেলে হাত দিলেই পাঁচ মিনিট ধরে কনসার্ট শোনায়। ওদিকে বিমর্ষ বৃদ্ধনিবাসে এক বৃদ্ধ। ঈশ্বরের সঙ্গে বোঝাপড়া করছেন। হিসেব মেলাচ্ছেন। ঈশ্বর ইংরেজিতে বলছেন—দিস ইজ ইওর ফেট। পুরাকালের বল্মীক স্তূপ থেকে উঠে এসে কাঁধে হাত রাখছেন তুলসীদাস। এ-কাল, সে-কাল, ইউরোপ, আমেরিকা, ভারত, একই চিত্র, হে বৃদ্ধ!

গোউয়া দোকে কুত্তা পালে ওস্‌কি বাছুর ভুখা।
শালেকে উত্তম খিলাওয়ে বাপ্ না পাওয়ে রুখা ॥
ঘরকা বহুরি প্রীত না পাওয়ে চিত চোরাওয়ে দাসী।
ধন্য কলিযুগ তেরি তামাসা দুখ লাগে ঔর হাঁসি ॥

উমা তাকাল। বড় বড় চোখের পাতা মৌসুমী মেঘের মতো ভারী। একটা কথাই বললে,

'কোনো উপায় নেই।'

'সেই একই ভাগ্য আমারও। আর কোনো উপায় নেই। বউদিকে কে দেখবে? কে মানুষ করবে ছেলেমেয়ে দুটোকে?'

'কে বাবাকে খাওয়াবে! কে ওঠাবে বসাবে? কে সেবা করবে মায়ের!'

'এও কবিতা উমা। পাওয়া যায়; কিন্তু কেন পাবো! হৃদয়ের চার প্রকোষ্ঠেই রক্ত; কিন্তু মিশে যাওয়ার উপায় নেই। ওই তো কবিতার

বাসভূমি। আশার মুকুল ওইখানেই মাথা তোলে,

যেখানে আকাশে খুব নীরবতা, শান্তি খুব আছে,
হৃদয়ে প্রেমের গল্প শেষ হলে ক্রমে-ক্রমে যেখানে মানুষ
আশ্বাস খুঁজেছে এসে সময়ের দায়ভাগী নক্ষত্রের কাছে:

সেই ব্যাপ্ত প্রান্তরে দু'জন; চারিদিকে ঝাউ আম নিম নাগেশ্বরে হেমন্ত আসিয়া গেছে—

তারপর উমা? শেষটা বলো—ধানসিড়ি নদীর কিনারে আমি শুয়ে থাকব—ধীরে-পউষের রাতে কোনোদিন জাগব না জেনে—কোনোদিন জাগব না আমি— কোনোদিন আর।'

'প্রসাদদা কবিতা আপনাকে বাঁচিয়ে রেখেছে, তাই না!'

'আর তোমাকে বাঁচিয়ে রেখেছে গান। তুমি এইবার লক্ষ্মী মেয়ে হয়ে শুয়ে পড়ো। শুয়ে শুয়ে এই লাইন দুটো নাড়াচাড়া করো:

কল্পনার হাঁস সব—পৃথিবীর সব ধ্বনি সব রঙ মুছে গেলে পর
উড়ুক উড়ুক তারা হৃদয়ের শব্দহীন জ্যোৎস্নার ভিতর।

সময় যেন সুন্দরী রমণীর মতো আমার সামনে দিয়ে হেঁটে চলেছে। পায়ে ছ' ইঞ্চি উঁচু স্টিলের হিল লাগানো জুতো। আমি সময়কে ধরার জন্যে ছুটছি, না সময় আমাকে প্রলোভন দেখিয়ে বিচিত্র বিচিত্র অভিজ্ঞতার প্রান্তরে টেনে নিয়ে যাচ্ছে।

বাড়িতে ঢোকামাত্রই বউদি বললে, 'তুমি ছিলে কোথায়? সাঙ্ঘাতিক ব্যাপার। পিউ পেটের যন্ত্রণায় কাটা পাঁঠার মতো ছটফট করছে।'

'কি খেয়েছিল?'

'কিছুই না। যা স্বাভাবিক খাওয়া তাই খেয়েছিল। হঠাৎ বললে মা পেটব্যথা করছে। এখন বাড়তে বাড়তে এমন অবস্থা শুতে, বসতে পারছে না। তুমি যা হয় কিছু কর ঠাকুরপো।' আর কোনো কথা নয়। কবিতা, উমা, হাওয়ার রাত, নক্ষত্র, সব হাওয়া। পিউ আমার প্রাণ। ডক্টর রায়, বিলেত ফেরত, যেমন পসার, তেমন ডাঁট। বউদির জন্যে একবার কল দিতে গিয়েছিলুম। কথা খুবই কম বলেন। সে অবশ্য ভালই। রোগ হল দাগী আসামী। জেলখানার দারোগার মেজাজ। আক্রমণ করার মধ্যে একটা যুক্তি খুঁজে পাওয়া যায়। রোগী, রোগ, পরিজন, তিন পক্ষই যেন ভয়ে সিঁটিয়ে থাকে। ওঝারা তো ঝাঁটাপেটা করেই ভূত ছাড়ান। এক আধারে ওঝা আর ডাক্তার মেলাতে পারলে এফেক্ট ভাল হয়। আমাকে সোজা বললেন, 'আমার

ভিজিট জানেন ? একশো টাকা। আপনার পক্ষে টুউউ এক্সপেনসিভ। দিস ইজ এ সর্ট অফ বিলাসিতা। আপনি আপনাদের মতো একজনকে নিয়ে যান। দেয়ার আর সো মেনি। আমি নমস্কার করে পালিয়ে এসেছিলুম। প্রণাম তোমায় ঘনশ্যাম। আর জীবনে ওমুখো নয়। মরে যায়, মরে যাই সেও ভি আচ্ছা।

আমার পাগলা ডাক্তারই ভাল। দু, দুবার আমাকে সাক্ষাৎ মৃত্যুর হাত থেকে ফিরিয়ে এনেছেন। মাঝে মাঝে রাতে গাছতলায় গাড়ি পার্ক করে ঘুমিয়ে পড়েন। ফি নিয়ে মাথাব্যথা নেই। দিলে, না দিলে, যা দিলে। যা ওষুধ স্যাম্পল এল ফ্রি দিয়ে দিলেন। এ কেমন ডাক্তার ! বড়লোক, ছোটলোক বিচার নেই। বড়লোক তাই কল দিতে লজ্জা পায়। মুখে বলবে, অমন একজন ডাক্তার হয় না ; কিন্তু পাগল। আসলে ডাক্তারের জগতে সোস্যালিজম নেই। ওখানে শুধুই ক্যাপিটালিজম।

মাকড়সা আর অসুখ দুজনে আলোচনা হচ্ছে, কে কোথায় আশ্রয় নেবে। ঠিক হল মাকড়সা যাবে রাজবাড়িতে। অসুখ যাবে চাষার বাড়ি। তাই হল। রাজবাড়িতে মাকড়সা ঝুল বোনে, হাজার ভৃত্য সঙ্গে সঙ্গে ঝেড়ে ফেলে। ওদিকে চাষার কোঁ-কোঁ করে জ্বর আসে। চাষা পান্তা খেয়ে মাঠে চলে যায়। তখন তারা বাড়ি পাল্টে নিলে। চাষার বাড়ি ঝুল বোনে মাকড়সা, তারা গ্রাহ্য করে না। রাজবাড়িতে কেউ একবার হাঁচলেই ডজন ডজন বৈদ্য।

ডক্টর পাকড়াশী সঙ্গে সঙ্গে চলে এলেন আমার সঙ্গেই। পিউ দাঁতে দাঁত চেপে যন্ত্রণা সহ্য করছে। ডাক্তারবাবু পেটের একটা জায়গায় হাত ঠেকানো মাত্রই পিউ আর্তনাদ করে উঠল। ডাক্তারবাবু বললেন, 'অ্যাপেন্ডিসাইটিস। ইমিডিয়েট অপারেশান। বার্স্টিং স্টেজে এসে গেছে। ফাটলেই পেরিটোনাইটিস তখন মাচ প্রবলেম।'

পিউকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া যাবে না। পাতাল শব্দটা বড় অর্থপূর্ণ। রোগীকে পাতালে ফেলে রাখবে। প্রথমে বলবে জায়গা নেই। মুরুব্বি ফুরুব্বি ধরে জায়গা হলে রাতটা ফেলে রাখবে বাথরুমের সামনের নোংরা মেঝেতে। হাত, পা মাড়িয়ে মাড়িয়ে সকলের যাতায়াত। বলবে অপেক্ষা করুন। একজন খাবি খাচ্ছে। খালি হলেই বেডে তুলে দোব। রেস্তোরাঁর মতো। একটু বাইরে দাঁড়ান। তিন নম্বর টেবিলে চা নিয়েছে। এখুনি মৌরি মুখে দিয়ে উঠে যাবে। একটু নজর রাখুন। এও উঠে যাবে টেবিল ছেড়ে নয়, পৃথিবী ছেড়ে।

কাছাকাছি একটা নার্সিংহোম আছে। পরিচালক বিশাল এক ব্যক্তি। তাঁর সবই ভাল, একটাই ত্রুটি মানুষকে কিছুতেই মানুষ ভাবতে পারেন না। মাঝে মাঝে হয়তো চেষ্টা করেন ; কিন্তু আসে না। অগতির গতি দীনের ভগবান বাল্যবন্ধু সত্যেনই আমার ভরসা। টেলিফোনেরও কি ঝামেলা। এক বাড়িতে বন্ধুস্থানীয় একজন বললেন, 'মাইরি বলছি। তুই দেখে যা, টেলিফোন তাকে তুলে রেখে দিয়েছি গণেশের পাশে। ন মাস কোনো ডায়ালটোন নেই।' পাড়ায় একটা মাত্র ফোন চালু আছে, একটা দোকানে। দরজা ভেতর থেকে বন্ধ। কেউ একজন শুয়ে আছে। দু' নাকে শুম্ভ-নিশুম্ভের লড়াই চলেছে। মনে হয় খুব স্বাস্থ্যসচেতন, সেই প্রোভার্ব মনে রেখেছেন, আরলি টু বেড অ্যান্ড আরলি টু রাইজ, মেক ওয়ান হেলদি, ওয়েলদি অ্যান্ড ওয়াইজ। ডেকে, দরজা ধাক্কা দিয়ে কিছুই করা গেল না। একজন বললেন, 'কম্পিউটার কনট্রোলড ঘুম, প্রোগ্রাম করা আছে। যখন ভাঙবার তখন ভাঙবে।' আর একজন উপদেশ দিলেন, 'দেখুন কোথায় ইলেকট্রনিক এক্সচেঞ্জ আছে। সেই লাইনে কানেকসান পাবেন।' ভদ্রলোক এক মহিলার নাম বললেন। তিনি একটু রাজপথে হাঁটায় অভ্যস্থ। তিনি নিজেও হট, তাঁর লাইনও হট। গরজ বড় বালাই। সমস্যা একটাই। তাঁর কাছে পৌছবো কিভাবে। একালের নেতা আর বারবনিতা মাস্তান পরিবৃতা। আবার উপদেশ, রবিদাকে ধরো। এই সময় মাল খেয়ে রকে বসে আছে। একসময় রবিদা ওকে যাত্রাকুইন করতে চেয়েছিল। হিরোইন হয়েওছিল। বইটার নাম ছিল, চৌবাচ্চার চার ফুটো। জমিদার জোতদারের বই। আরো একটা বই করেছিল, নরকে বলড্যান্স।

রবিদাকে চিনি। মেজাজী লোক। রাতে বাড়িতে খায় না। ভাঁড়ে করে মাটান চাঁপ আসে আর তন্দুর। বউকে সেকালের ভাষায় আদর করে বলে, মাগী। আমাকে একদিন বলেছিল, কি মাল খেয়ে, মাল খেয়ে বলছিস, রবি রায় মালের পেছনে যেমন লাখ দুয়েক উড়িয়েছে তেমনি লাখ পাঁচেক লোক চিনেছে।

রবিদা টং হয়ে বসেছিলেন। আমার সমস্যা শুনে তড়াং করে উঠে পড়ে বললেন, 'চল্ শালা, তোকে ফোন করতে দেয়নি। আজ ফ্যান-ফোন-ফ্রিজ কার জন্যে হয়েছে রে শালা ? এক সময় আমার এই গোদাপায়ে পড়ে থাকত। আজ শালা কাঁচা খিস্তি দিয়ে ভূত ভাগাব।'

'রবিদা শোনো, তুমি মালের ঘোরে সব উল্টোপাল্টা করে ফেলছ।'

'কি বললি মালের ঘোর ? আমি মাতাল ?'

'না না, মাতাল নও, আমার বোঝাতে ভুল হয়েছে। আমি ভয়ে ফোন করতে যেতে পারিনি।'

'ভয় ? কিসের ভয় ? রবি রায় কারোকে ভয় করে না। চল শালা। আমি ভীতু ?'

খপ করে আমার জামার পেছনের দিকে কলারটা থাবার মতো হাতে খামচে ধরল।

নতুন ফ্ল্যাট। তা তো হবেই। টাকার কি অভাব আছে। মিনিটে দেড়লাখ লোক জন্মালে টাকা জন্মায় দেড় কোটি। ছাপার যন্ত্র ঘুরছেই। ওয়াগন ওয়াগন সোনা জমা রাখো আর যন্ত্র ঘোরাও। সেই জলতরঙ্গ কলিংবেল। ডেকে কথা বলে চলে যাওয়ার পরেও যা বাজে। দরজা খুলে গেল। ভেতরটা স্বপ্ন। সেই মহিলা এগিয়ে আসছেন। যেন উল্টোপালের নৌকো। কি একটা পরেছেন, কাঁধ থেকে নীচের দিকটা ঝুলতে ঝুলতে একটা ফানুস।

'ও রবিদা! আপনি। কি ভাগ্য!'

রবিদার কোনো হম্বিতম্বি নেই। নারী মোহিনী। রবিদা গলে থ্যাসথেসে হয়ে গেলেন। মহিলা আমাকে ফোনটা দেখিয়ে দিয়ে রবিদার সঙ্গে কথা বলতে গেলেন। সেই স্যাঁতসেঁতে পারফ্যুমের পরিচিত গন্ধ। ভেতরে মুরগী রান্না হচ্ছে। বোঝাই যায় মহিলাও পান করছিলেন। সিগারেটের গন্ধ আসছে। অবশ্যই শয্যায় কোনো পুরুষ আছে। কোনো কোনো জীবনে রাত খুব মূল্যবান। অপচয় মানেই লোকসান।

সত্যেন ফোন ধরল, 'কিভাবে আনবি ?'

ট্যাক্সিতে সত্যেনের আপত্তি। তাছাড়া কলকাতার কাছে হলেও জায়গাটা একটা গ্রাম। গ্রামেরও অধম। খালের এই দিকে ট্যাক্সি আসতে যেন পায়রার সঙ্গম-নৃত্য। না যাবো না। ট্যাক্সিচালক যেন ব্রীড়াবনত যুবতী। শেষে কলা দেখাতে হবে। একস্ট্রা দোবো গুঁপো সুন্দরী। টাকার চুমুতে তিনি রাজি হবেন। এদিকে কত কেতা! ট্যাক্সি কি আপনাকে রিফিউজ করেছে, তা হলে এই নম্বর ডায়াল করুন। বাস্, টেলিফোনই খতম। আর যদি পাওয়াই যায় তা হলেই বা কি! কে প্রমাণ করবে! আর আইন যারা প্রয়োগ করবেন তাঁদের মুখে ললিপপ গুঁজতে কতক্ষণ ? গাড়ির এগজস্ট ধোঁয়া ছেড়ে পরিবেশদূষণ করছে! ভয়ঙ্কর অপরাধ। আইনত দণ্ডনীয়। সত্যই তো, কৃষ্ণের জীবেরা ক্যানসারে মরবে। খোদ স্টেটবাস যে-পরিমাণ ধোঁয়া ছাড়ে একাই একশো।

চাঁদার জুলুম! লালবাজারে স্পেশ্যাল সেল। ঘোড়ার ডিম। সর্বস্তরে মশকরা। একটা দেশলাই বেরিয়েছে তার কাঠির এমন কারিকুরি, জ্বলতে জ্বলতে ভেঙে পড়বে না। দেখা গেল সে-কাঠি আর জ্বলেই না। একটা কিছু ধরাতে দশবার চেষ্টা করতে হয়।

সত্যেন বললে, 'ঠিকানা দে। অ্যাম্বুলেন্স পাঠাচ্ছি। দাদা আর ভাইঝি দু'জনকেই নিয়ে আয়।'

'দুজনের খরচ সামলাবো কি করে ?'

'দুটো কেসই ভয়ঙ্কর সিরিয়াস। কাকে রাখবি আর কাকে মারবি তা হলে ঠিক কর।'

'এই মুহূর্তে আমার কাছে দু' হাজার আছে।'

যার ফোন ব্যবহার করছি তার একদিনের কামাই কত ? এ-দেশে ছেলেদের যদি মেয়েদের মতো দেহবিক্রির সুযোগ থাকত! এছাড়া তো আর কোনো জীবিকা থাকছে না। সবই তো বন্ধ। টাকার দাম তো খোলামকুঁচি। কেন্দ্রে মাইনরিটি সরকার টলমল। শিবরাসনের মতো টেররিস্ট আরো কত আছে!

সত্যেন বললে, 'শুনতে পাচ্ছিস ?'

'হ্যাঁ পাচ্ছি। বল'

'তুই জয় মা, বলে দুজনকেই নিয়ে আয়। টাকার ভাবনা পরে হবে।'

মহিলা রবিদার সোফার হাতলে বসে আছেন। কি সুন্দর চেহারা! রোগ, শোক, জরা, ব্যাধির বালাই নেই। নিটোল যৌবন। ফুলদানির ফুলের মতো বাহারি। ন্যায়, নীতি, আদর্শ, ধর্ম সব বোগাস। কিছু মানুষকে ভোগ থেকে সরিয়ে রাখার জন্যে কিছু মানুষের অভিসন্ধিমূলক পরিকল্পনা। শাঁসটা আমাদের, ছোবড়াটা তোমাদের। আদর্শ যে কারেন্সি নোট নয়, তা এই মুহূর্তে আমি হাড়েহাড়ে বুঝছি।

মহিলার দিকে আমি মুখ তুলে তাকাতে পারছি না। আমার অভ্যাস নেই। রবিদা পাকা লোক। সে চটকে যাচ্ছে। মহিলা আলুলায়িত হেসে বললেন, 'কথা হল ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

রবিদা খেপে গিয়ে বললে, 'মারবো নিতম্বে পুরুষ্টু এক লাথি। আজ্ঞে হ্যাঁ। যেন স্কুলের দিদিমনির সঙ্গে কথা বলছে রাস্কেল।'

মহিলা ফিক ফিক করে হেসে বললেন, 'জীবনে এই প্রথম আমাকে কেউ আজ্ঞে বললে।'

তারপরই অদ্ভুত এক কাণ্ড হল। মহিলা দু' হাতে রবিদাকে জড়িয়ে ধরে হাউহাউ করে কাঁদতে লাগল, 'রবিদা, তুমি আমার বাবার মতো। তুমি মাইরি আমাকে বাঁচার পথ বলে দাও।'

আর রবিদা কেবলই বলতে লাগল, 'যাঃ শালা, মাতাল হয়ে গেছে।'

আর ঠিক তখনই। সে দৃশ্য আমি ভুলতে পারব না। বিশাল চেহারার সম্পূর্ণ উলঙ্গ, মধ্যবয়সী একটা লোক ভেতরের ঘর থেকে টলতে টলতে বেরিয়ে এল ভল্লুকের মতো। মহিলার ঘাড় ধরে টানতে টানতে ভেতরে নিয়ে চলে গেল।

রবিদা ভীষণ অবাক হয়ে বললে, 'যাঃ শালা, এই দামড়া খোকাটা আবার কে?'

এক বুড়ি এসে খ্যানখেনে গলায় বললে, 'তোমরা এখন যাও।'

রবিদা ছাড়ার পাত্র নয়। বললে, 'ওই জন্তুটা কে?'

বুড়ি বললে, 'ন্যাকা! কিছুই যেন বোঝে না।'

রবিদা রাস্তায় নেমে অন্ধকারে হা হা একটা যাত্রামার্কা হাসি ছাড়লে। দুটো কুকুর সাধু সাধু না বলে গগন ফাটানো চিৎকার জুড়ে দিলে; রবিদা বললে, 'প্রসাদ, কোনো শালাই সুখী নয় রে! নাঃ কাল থেকে র চালাই। জল আর একদম মেশাব না। জল মানেই শালা ভেজাল। ভেজাল মেশানো মহা অপরাধ। ওই পাপেই না নরকে যেতে হয়।' বলেই কান্না, 'কত জল মিশিয়েছি প্রভু! না জেনে অপরাধ করে ফেলেছি। তোমার সন্তানকে ক্ষমা কোরো প্রভু?' এরপর শুরু হল গান, 'মা আমি তোর কোলের শিশু।' হঠাৎ গান বন্ধ করে ভীমবিক্রমে বলে উঠল, 'শালাকে পেঁদিয়ে আসি। মেয়েটাকে বলাৎকার করছে। ঘরে বসে রেপ! ঘরে বসে ডাকযোগে সেলাই শিক্ষা!'

অন্ধকার থেকে মোটা গলায় কে বললে, 'অ্যায় রোবে বাড়ি যা।'

॥ সাত ॥

পিউকে স্ট্রেচারে করে তুলতে হল। অত যন্ত্রণা। ফর্সা টকটকে মুখ লাল হয়ে গেছে। তবু আমার গলাটা জড়িয়ে ধরে, যেন বহুদূর থেকে বললে, 'কাকু, আমি যাই। কাল সকালে চাটা তুমি একাই খেয়ো।' আমার গলায় কথা আটকে গেল। চোখে জল এসে গেল হু হু করে। কেন এমন বললে? দাদা নিজে নিজেই উঠলে। কেবল এক কথা, 'তোর সবই বাড়াবাড়ি! সব পাইকিরি

রেটে নার্সিংহোমে চালান করে দিচ্ছিস? আমার কি এমন হয়েছে! অ্যান্টিবায়োটিক পড়ছে। আজ না হয় কাল, এমনিই সেরে যেত। বন্ধু ডাক্তার হলে এই বিপদ। কিভাবে কি ম্যানেজ করবি কে জানে!

মাথার ওপর লাল আলো খেলিয়ে অ্যাম্বুলেন্স ছুটছে। আজ পথে লরিদানবের অত্যাচার কিছু কম। পিউ দাঁতে দাঁত চেপে পড়ে আছে। দাদা এক একবার জিজ্ঞেস করছে, 'পিউ, মা আমার খুব কষ্ট হচ্ছে?' কথা বলতে পারছে না; তবু চেষ্টা করছে হাসার।

আমার মনে ডঙ্কা বাজছে। 'প্রসাদ দেখো, ধাক্কাটা এইবার কোনদিক থেকে আসে।' প্রাণপণে ভগবানকে ডাকছি। নেই কেউ, তবু ডাকি। পিউয়ের এই কষ্ট আমি সহ্য করতে পারছি না। আমার জীবনের সবুজ ঘাস, ভোরের শিশির, পাখির ডাক। মেয়েটা আমার জন্যই পৃথিবীতে এসেছে।

চিন্তাটা হঠাৎ ঘুরে গেল। এসে গেল অর্থচিন্তা। যেভাবেই হোক ম্যানেজ করতে হবে। সেটা কি? কার কাছে হাতপাতা যায়? কাল বৌবাজারে গিয়ে আংটিটা বেচার চেষ্টা করব। আর তা না হলে মহিমদাকে বলব, দাদা, আপনার আংটি আপনিই এইবার কিনে নিন বাজার দামে।

হাসপাতালে কেউ দেবে না আমি জানি। হঠাৎ বিশল্যকরণীর কথা মনে এল। আসল নাম নয়। আমরা রেখেছি। ছাত্রজীবনে স্কুলে বোমা ফেলে ইতিহাস তৈরি করেছিল। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বাম আন্দোলনের সূত্রপাত। বুর্জুয়া শিক্ষাব্যবস্থার মূল উৎপাটন। প্রধান শিক্ষককে ঘেরাও করে রেখেছিল চব্বিশ ঘণ্টা। সকলেই ধন্য ধন্য করতে লাগল; বললে এ ছাত্রনেতা সেই কবিতারই উত্তর—আমাদের দেশে কবে সেই ছেলে হবে। কথায় না বড় হয়ে কাজে বড় হবে! এই তো সেই ছেলে! পাঁচের দশকের শুরুতেই তার আবির্ভাব। সাবাশ্ বীর, সব ধ্বংস করে ফেল। চেয়ার, টেবিল, ফ্যান, ফোন। এ আজাদি ঝুটা হ্যায়। নতুন স্বাধীনতা, প্রকৃত স্বাধীনতা আসছে।

হঠাৎ তার কি হল কে জানে! বেশ কিছুদিন বেপাত্তা হয়ে গেল। ফিরে এল ক্যাপিটালিস্ট হয়ে। জামা, পার্টি, আদর্শ, সব পাল্টে ফেলেছে। আমাদের বুঝিয়ে দিলে, হনুমান হসনি। মানুষ হ। কি রকম! বিশল্যকরণী প্রাণদায়ী। আছে কোথায় গন্ধমাদনে। হনুমান কি করলে? গোটা পাহাড়টা মাথায় নিয়ে চলে এল। মজুরের কাজ। জাস্ট এ লেবারার। আবার কি রকম মজুর? না বন্ডেড লেবার। যার বিরুদ্ধে আজ আমাদের এত আন্দোলন! কোনো মজুরি নেই। প্রভুর সেবা। এর ফল? রাম-লক্ষ্মণ-সীতা রাজ্যপাট গুটিয়ে সরে

পড়লেন। হনুমান আজও গাছে গাছে হুপহাপ করছে আর আধলা ইট খাচ্ছে। বিদেশে চালান হচ্ছে, নানারকম ডাক্তারি পরীক্ষার জন্যে। আর সবচেয়ে প্যাথেটিক অবস্থা বাঁদরের।

লেখাপড়া করা ছেলে। পট্ করে একটা তুলসীদাসের দোঁহা শুনিয়ে দিলে। আজও আমার মনে আছে। বাঁদর খুব দুঃখ করে বলছে,

কুদকে সাগর উতারা, কোহি কিয়া মিৎ।
কোহি ওখ্ড়া গিরি দরখৎ, কোহি শিখায়া নীৎ ॥
ক্যা কহুঙ্গা সীতানাথকো, ম্যায়নে কিয়া চোরি।
সোহি কুল্ উদ্ভব রো, বেদিয়া খিঁচে ডোরি ॥

বাঁদরের গলায় দড়ি বেঁধে নিয়ে যাচ্ছে খেলা দেখাতে। বাঁদরঅলার হাতে ছপটি। সারাদিন পথে পথে নাচ দেখাবে বাঁদর। বাঁদর এইবার মনের দুঃখে বলছে, সীতানাথ দেখো কাণ্ড, বানরবংশে আমার জন্ম। আমার পূর্বপুরুষদের অনেকে একলাফে সমুদ্রলঙ্ঘন করেছে, কোনো বীর আপনার বন্ধু হয়ে প্রসিদ্ধ হয়েছে, কেউ কেউ মহাশক্তিধর ছিলেন, গাছপালা পাহাড়পর্বত উৎপাটন করেছে, কেউ ছিলেন অসাধারণ জ্ঞানী, নীতিশিক্ষা দিয়েছেন, আর সেই বংশের ছেলে আমি, আমার দশা দেখো। প্রভু প্রশ্ন এই, আমার অপরাধটা কি ?

বিশল্যকরণী বললে, অপরাধ নয়, ওরা ছিল বোকা, আইডিয়্যালিস্ট, আবার ধার্মিক। ধর্মের মতো শ্লেভারি কিছু নেই। ধর্ম হল অবস্থা বুঝে নিজেকে পাল্টানো। যখন যাকে ভজলে কাজ হবে তাকে ভজো। দেবতার অভাব নেই। আমাদের দেবদেবীর সংখ্যা তেত্রিশ কোটি। বহু ধর্ম। মানেটা কি ? ভবিষ্যৎদ্রষ্টারা জানতেন, এই ব্যাটাদের এই রকমই হবে। হাজারটা দল, কয়েক হাজার নেতা। নেতারাই দেবতা। নেতা ইন পাওয়ার ইজ গড। আজ ভজি ইন্দিরা, কাল ভজি রাজীব, পরশু ভজি ভিপি, তো তরশু নরসীমা। চন্দ্র মেরেছিলেন উঁকি। কিন্তু চন্দ্রের অমাবস্যা, পূর্ণিমা আছে।

বিশল্যকরণী হল টাকা। গন্ধমাদনের কোথায় সেটি আছে, বুঝে নিয়ে ঝপ করে বুদ্ধির হাত বাড়াও। মজদুরি করলে হবে না। আজেবাজে শীতলা, মনসা লৌকিক দেবদেবী অর্থাৎ লোক্যাল লিডার, মিনস্টার অফ স্টেট ভজলে হবে না। প্রথমসারির দেবতাদের ধরতে হবে।

আমি ভাই বিশল্যকরণী চিনে গেছি, ধর্মও শিখে গেছি, শিখে গেছি যত মত তত পথ। আমার আর পিছন ফিরে তাকাবার প্রয়োজন নেই।

অ্যাম্বুলেন্স চলেছে। মনটাকে ঘোরাবার জন্যে কত কি ভাবছি। হঠাৎ পিউ

ইশারায় আমার কানটা তার মুখের কাছে আনার ইঙ্গিত করল। পিউ বললে, 'কাকা, বুল আমার কাছে বড় একটা রবারের বল চেয়েছিল। আমি একটু একটু করে পয়সা জমাচ্ছিলুম। আমার বইয়ের ব্যাগের ভেতর ছোট একটা ব্যাগে পয়সাগুলো আছে। মনে হয় হয়ে যাবে। যদি কম পড়ে তুমি দিয়ে ওকে একটা বড় রবারের বল কিনে দিয়ো কাকু।'

পিউ যন্ত্রণায় কুঁকড়ে গেল। দাদা শুয়ে শুয়ে দুলছে। মাঝে মাঝে হাত বাড়িয়ে পিউকে স্পর্শ করছে। দাদাকে দেখছি আর নিজেকে মনে হচ্ছে নিয়তি। আমি জানি দাদার কি হবে। জীবনের শ্রেষ্ঠ একটি সম্পদ হারাবে। কিছুই করার নেই। অ্যাম্বুলেন্স হাসপাতালের দিকে যাচ্ছে না, হু হু করে ছুটছে অন্ধকার ভবিষ্যতের দিকে। যে পরিণতি উজ্জ্বল নয় তার দিকে এগিয়ে যেতে কেমন লাগে ! এই এখন যেমন লাগছে।

পিউয়ের দুটো একটা কথা, মনে কিন্তু ভয়ঙ্কর দাগ কেটে যাচ্ছে। বউদি সবচেয়ে ভাল ফুলছাপ ফ্রক পরিয়ে দিয়েছে। গায়ের রঙের সঙ্গে কি সুন্দর মানিয়েছে ! কিশোরীর টাটকা চুলে রেশমের জেল্লা। মেয়েটা সুন্দর বাড়ছিল। এখনই মাথায় বেশ লম্বা। পা দুটো কি সুন্দর ! ভগবানের এক নম্বর সৃষ্টি।

অ্যাম্বুলেন্স ঝিমধরা হাসপাতালে ঢুকল। নির্জন নির্জন আলো। বাঁধানো পথ দুটো একটা গাছ। অল্পস্বল্প আবর্জনা। সামান্য সামান্য ভাঙাচোরা। হিসহাস বাতাসের শব্দ। স্ট্রেচার নামানোর শব্দ। জুতোর খসখস। ছায়া ছায়া দু-চারজন লোক। দীর্ঘদেহী সত্যেন সাদা অ্যাপ্রন পরে দেবতার মতো দাঁড়িয়ে আছে। ঝুঁকে পড়ে পিউকে দেখল। মেয়েটাকে দেখে মুগ্ধ হয়ে গেছে। কার না ইচ্ছে করবে, এইরকম একটি মেয়ের পিতা হতে। বড় বড় কাঁচের মতো চোখ। ছোট্ট কপাল, সুগঠিত নাক।

পিউ অদ্ভুত একটা কাণ্ড করল। ওই অবস্থায় দু হাত জোড় করে নমস্কার করল সত্যেনকে। মিষ্টি গলায় বললে, 'ডাক্তারবাবু, আমার বাবাকে ভাল করে দেবেন তো !'

সত্যেন অভিভূত হয়ে পিউয়ের চুলে হাত রাখল।

এরপর খুব দ্রুত সব ঘটতে লাগল। কোথা থেকে আর একজন সুন্দর চেহারার ডাক্তার এলেন। এসে গেলেন অ্যাসিস্টেন্ট, সৌম্য চেহারার নার্স, অ্যানেসথেসিয়ার ডাক্তার। এ-জগতে রাত নেই, দিন নেই, আছে সময়। আছে হৃদয়ের শব্দ। রক্তের ওঠা-পড়া। আছে বোতল থেকে ফোঁটা ফোঁটা

ঝরে পড়া নুনজল। ছোট ছোট আদেশ, উপদেশ। আর আছে অসীম আত্মবিশ্বাস ও প্রখর সংকল্প। হাত থেকে ঘুড়ি কেটে বেরিয়ে গেলে যে রকম লাগে আমার এখন সেইরকম লাগছে। দুই প্রিয়জন আমার হাতের বাইরে চলে গেল। একদল অভিজ্ঞ মানুষের জগতে। সত্যেন আমাকে একপাশে নিয়ে গিয়ে বললে, 'তুই এখন কি করবি ? তোর তো কিছুই করার নেই।'

'দুটো কাজ করার আছে, অপেক্ষা আর দুশ্চিন্তা। তুই কি এখনই অপারেশান করবি ?'

'মেয়েটাকে তো এখনি চাপাতে হবে। কি অদ্ভুত মেয়ে রে ! তুই তা হলে বোস। আমরা আমাদের কাজ করি।'

'মোট কত টাকা লাগবে বল তো ?'

'লাখ টাকা। টাকার চিন্তায় মরে যাচ্ছিস ? আমার টাকার অভাব নেইরে গাড়ু !'

সেই ছাত্রজীবনের সত্যেন। ভেঙে পড়লেই যে আমাকে বলত, মনকে বিশ্বাসের ভিটামিন খাওয়া, আত্মবিশ্বাসের ওয়্যারিং চেক কর। কোথাও শর্টসার্কিট হয়ে বসে আছে। সত্যেন পিঠে চাপড় মেরে বললে, 'হেল্প ইওরসেল্ফ। আমি চললুম।'

সত্যেন চলে যেতেই, আমার সামনে সুন্দর ভদ্রচেহারার একটি ছেলে এসে দাঁড়াল। তার হাতে এনামেলের ট্রে। তোয়ালে চাপা কিছু রয়েছে। একটু ইতস্তত করে বললে, 'আপনিই প্রসাদদা ?'

'হ্যাঁ তুমি কে ?'

'আমার দিদির নাম উমা।'

'কি আশ্চর্য ! তোমার সঙ্গে কেমন দেখা হয়ে গেল। আজই সন্ধেবেলা তোমার দিদিকে বলছিলুম, তোমার সঙ্গে দেখা হয় না কেন ? তোমার নাম ?'

'আমার নাম শঙ্কর। পিউ আমাকে চেনে।'

'কি করে ?'

'পিউ যেখানে নাচ শেখে, আমি সেখানে সময় পেলে তবলা বাজাতে যাই।'

'তুমি তবলা জানো ?'

'আমি শেখার চেষ্টা করছি প্রসাদদা'

'ট্রেতে কি ?'

'পেট কাটার যন্ত্রপাতি।'

'মনে হচ্ছে খাবারদাবার।'

'আমি যাই প্রসাদদা। এখানে নিয়মের খুব কড়াকড়ি।'

শঙ্কর করিডর ধরে হাঁটতে হাঁটতে চলে গেল। সাদা জামাকাপড় কোঁকড়া চুল। ফর্সা রঙ। শঙ্করের ছায়া দীর্ঘ হচ্ছে। একসময় কায়া আর ছায়া দুটোই ঢুকে গেল দূরের একটা ঘরে। আমি বাইরে এসে দাঁড়ালুম। ঘটনার ঝড় বয়ে গেল।

স্যাটেলাইট পিকচার অফ স্টর্ম। দেখেছি আমি। মাঝখানে একটা গর্ত। সেইটাকে বলে আই। আই অফ দি স্টর্ম। সেই জায়গাটা শান্ত। একটা অঞ্চলের ওপর দিয়ে ঝড় চলেছে তুমুলবেগে, সব লণ্ডভণ্ড করে। হঠাৎ শান্ত। তার মানে থামা নয়। আইটা পাশ করছে। যেই চলে যাবে, আবার শুরু করে লণ্ডভণ্ড কাণ্ড। আমি এখন সেই আই অফ দি স্টর্ম-এ রয়েছি।

বাইরেটা মন্দ লাগছে না। মিহিরবাবুর মতো মিহি একটা বাতাস আজ বেড়াতে এসেছে শহরে। গজলের রাত। ঠুংরির রাত। বসন্তবাহারের রাত। ভগ্যিস আমার কবিতা ছিল। নির্জনে এলেই হাত ধরে। যদি কেউ প্রশ্ন করেন, 'তুমি ধনী কিসে ? হায়রে প্রসাদ ?' আমি ধনী আমার চিন্তায়। পৃথিবীর খাঁজে খাঁজে সুখ, ভাঁজে ভাঁজে ভাঁজ করা সিল্কের রুমালে চন্দনের গুঁড়োর মতো। ঝোপে ঝাড়ে, গাছের পাতায়, নির্জন নদীর ছোট ছোট তরঙ্গে, সূর্যাস্তের আকাশে আছে সেই আপনজন, বাউল তার একতারা ভুলে যাকে ডাকে, আমি কোথায় পাবো তারে ! আমার মনের মানুষ যে রে !

এ বেশ একটা অবস্থা। রাতটা ভেবে ভেবেই কাটাতে হবে। ভাগ্য ভাল মশা নেই। মনের মালগাড়িতে চেপে একবার বাড়ি ঘুরে এলুম। কালো কালো নির্জন রাস্তা লকলকিয়ে পড়ে আছে। গেট ঠেলে ঢুকলুম। বউদি জেগে আছে। ঘুমোয়নি। বসে আছে চুপ করে। বুল যে-ভাবে ঘুমোয়, হাত-পা ছড়িয়ে চিৎ। পহেলবান তো এইভাবেই শোয়। দাদার বিছানা খালি। পিউয়ের জায়গাটা শূন্য। বউদিকে দেখে মনে হচ্ছে—জেগে আছি একা, জেগে আছি কারাগারে। আমার বন্ধু, বুলের বন্ধু, সেই পথের কুকুর ডিউক, বসে আছে দরজার বাইরে। বাঘের বাচ্চা, থাক বসে। পাহারা দে আমার বউদিকে।

বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে গেলুম উমার বাড়ি। কোনো অসুবিধে হচ্ছে না আমার। অশরীরী হওয়ার এই সুবিধে। উমা বসে আছে। জ্বরে চোখ ছলছল করছে। পায়ে একটা পাড় জড়াচ্ছে শক্ত করে। যন্ত্রণার শ্রেষ্ঠ দাওয়াই।

মাথায় একটা ফেট্টি বেঁধেছে, কপালে। গলার কাছে হাত রাখলুম। বেশ গরম ; কিন্তু ভিজে ভিজে। মানে জ্বর এইবার ছাড়বে। জল খাবে বোধহয়। মশারি তুলে নেমে আসছে। অন্ধকারে আন্দাজ করে করে, সুইচবোর্ডের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

একবার সেই মহিলার বাড়িতে গেলুম। ফোন-মহিলা। সুদৃশ্য পালঙ্ক নেশায় বেহুঁশ। মত্তমাতাল ভল্লুকের মতো সেই লোকটা আধশোয়া হয়ে সিগারেট ফুঁকছে। থামের মতো পা দিয়ে সুন্দরীর নগ্ন পায়ে লাথি মারছে।

ফিরে এলুম আবার আমার জায়গায়। সিমেন্ট বাঁধানো ধাপে। ধুলো কিচকিচ। হঠাৎ গালিব সায়েবের কথা মনে পড়ল। কলকাতায় এসেছিলেন কবি ১৮২৮ সালের বিশ ফেব্রুয়ারি। চিৎপুর রোডে আলি সওদাগরের বড় একটা বাড়ি ভাড়া নিয়েছিলেন। মাসিক ভাড়া দশ টাকা। ওয়েলেসলি স্ট্রিটের আলিয়ার মাদ্রাসাতে রবিবারের মুশায়ারায় গজল পড়েছিলেন। তখন দশ টাকা ছিল না বলা হত দশ সিক্কা। অভাবী মানুষ ; কিন্তু মেজাজ ছিল আমিরের মতো। মনে হল এই গভীর রাতে গালিব চিৎপুর রোড ধরে চলেছেন ফিটনে চড়ে। অমন একজন রোমান্টিক মানুষকে ভোলা যায়। যারা অর্থবান ভল্লুক, তারা ওইসব লীলাবতীকে জাপটেসাপটে শুয়ে থাক। আমরা আমাদের ভয়ঙ্কর শূন্যতাকে প্রেয়সীর মতো বুকে নিয়ে বসে থাকি। তাকেই শোনাই গজল :

কহুঁ কিসসে মৈঁ কি ক্যাহৈ শবে গম বুরী বলা হৈ।
মুঝে ক্যা বুরা থা মরনা অগর একবার হোতা ॥

হাঁ গালিবা সাহাব ওহি একই কিস্‌সা হামারা ভি—দুঃখের এই রাতের কথা বলব কাকে। খারাপ লাগে কাঁদুনি গাইতে। মরতে তো আমার দুঃখ নেই। মানুষ তো একবারই মরে। কিন্তু আমাদের স্বপ্ন যে বারেবারেই মরছে।

পিউ আমার স্বপ্ন। বুল আমার স্বপ্ন। আমার স্বপ্ন দাদা, বউদি। নতুন স্বপ্ন উমা। জানি, জাগাস্বপ্নও ভেঙে যায়। প্রভু হাসিছ, খেলিছ এ বিশ্বলয়ে, বিরাট সিন্ধু আনমনে। বাঁ চোখের পাতা নাচছে। ছেলেবেলা থেকেই শুনে আসছি, অশুভ ইঙ্গিত। প্রসাদের মনে কুসংস্কার ঢুকেছে। অসহায় অক্ষম মানুষই কুসংস্কারে ভোগে। হাঁচি, কাশি টিকটিকি।

পেছনে পায়ের শব্দ। শঙ্কর। হাতে একটা কাপ।

'প্রসাদদা একটু চা খান।'

শঙ্কর তুমি আমার কথা ভেবেছ?'

শঙ্কর হাসল, 'এই সময় আমরা চা খাই।'

'ওদিকের খবর জানো?'

'পিউয়ের অপারেশান চলছে। বড়দা বেডে শুয়ে আছেন ; তবে আপনার যাওয়ার হুকুম নেই।'

শঙ্কর কাপটা নিয়ে চলে গেল। সামান্য চাকরি। পাকা হয়নি এখনো। ওর মতো ছেলে এই চাকরি করবে কেন? এর ফিউচার কি? ওকে আমি পড়াব। বিলেত পাঠাব। প্রসাদ যা বলে তাই করে। প্রয়োজন হলে ব্যাঙ্ক ডাকাতি করব। বেনারসে আমার এক দিদি আছে। সম্পর্ক। আমি দিদি বলি। অবাঙালি। মা ছিল বাঈজী। এই জর্দার লাইনেই আলাপ। মায়ের উপার্জন বহুত, বুদ্ধি করে নানা কারবারে খাটায়। জমিদার গেছে, রাজা রাজারা গেছে বাঈজীদের বরাতও ঢিলে হয়ে গেছে। কে শুনবে ইনিয়ে বিনিয়ে গাওয়া ওই গান, সেঁইয়া সেঁইয়া করে আড়াই হাত বিনুনি, ধরা ধরা গলায়। নিতম্বের দুলুনি, পায়ের ঠমকি, ঘাঘরার ঝাপট। হাত ধরে টানতে গেলেই ঝুল কেটে সরে যাবে, নেহি, নেহি, তিরছি নজরিয়া কা বাণ। অমনি, 'হয়, হয়' বলে টাকার তোড়া ছুঁড়ে দিল পায়ের কাছে রসিলি, মশিলি বাবু। যার দাঁড়াবারই ক্ষমতা নেই। নেশায় চুরচুর। কোনো কোনো মানুষকে কোনো কোনো মানুষের ভাল লেগে যায়। একটু স্বার্থ থাকতে পারে, সামান্য সেক্স থাকাও বিচিত্র নয়। সে মরুকগে। মহিলা আমাকে ভালবাসে। বেনারস গেলে তার কাছেই উঠি। দিলওয়ালি। এইবার তাকে ধরবো। কিছু করো। গোটাকতক পরিবারকে অন্তত বাঁচাও। তুমি যাবে, তোমার মালমশলা পাঁচভূতে মারবে।

কাল আমি মহিম হালদারের কাছে যাবোই। তুমি দাদা সেদিন আমাকে স্বপ্ন দেখিয়েছ। সেটাকে বাস্তবে নামাও। আমার অনেক কাজ আছে। চোখের সামনে ভাল ভাল শখানেক পরিবার ফৌত হয়ে যাচ্ছে। আর যাদের কোনো অধিকারই নেই তারা ধিনিক নাচ নাচছে। তুমি আমাকে ম্যানেজার ফ্যানেজার করো। নাচিয়েছো যখন ঘুঙুর দাও, ফ্লোর দাও। আর তা না হলে আমি বিশল্যকরণীর চেলা হব।

বিশল্যকরণী বললে, কি ওই এলেবেলে মাল নিয়ে পড়ে আছিস? জর্দা। নেশার জগৎ কোথায় এগিয়ে গেছে জানিস? মারিজুয়ানা, হেরোইন, কোকেন, হ্যাস্। মানুষকে মারার উপাদান যার মধ্যে নেই সে ব্যবসায় কোনোকালে কিস্যু হবে না। জীবনের দুটো সত্য, মরা আর বাঁচা। মরাটাকে একটু টেকনিক্যাল করে দে, মারা। মারা আর বাঁচানো। এর ওপর ব্যবসাকে দাঁড় করা। অ্যালফ্রেড নোবেল ডিনামাইট আবিষ্কার করলেন। ভাগ্যের চাকা ঘুরে

গেল। পৃথিবীর এক নম্বর বড়লোক। আমেরিকার অর্থনীতি দাঁড়িয়ে আছে সমরোপকরণ তৈরির ওপর। যুদ্ধকে ক্যাপিটাল করে অতবড় একটা ক্যাপিটালিস্ট দেশের যত বোলবোলা। গোটা পৃথিবীর ওপর ছড়ি ঘোরাচ্ছে। প্যারালাল দেখ, সমান শক্তিশালী মাফিয়া কিংডম। বিশ্বজুড়ে লক্ষ লক্ষ মানুষকে মারছে, হেরোইন আর কোকেন দিয়ে। একটা নারকোটিক বেল্ট তৈরি করে ফেলেছে। গোল্ডেন ট্র্যাঙ্গল। আমেরিকার কাছাকোঁচা খুলে যাওয়ার যোগাড়। নিকারাগুয়ার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে হল সৈন্যসামন্ত নিয়ে। কোকেনের বিরুদ্ধে গ্লোবাল ওয়ার। সেক্স আর এক মানুষ মারা ব্যবসা। এতকাল সিফিলিস দিয়ে মারছিল, এখন মারছে এডস দিয়ে। এইবার আয় ওষুধে। লাইফ সেভিং ড্রাগস। ভিটেমাটি বেচেও মানুষকে বাঁচা আর বাঁচানোর চেষ্টা করতে হবে। জমজমাট ব্যবসা। মাল্টিন্যাশনালস চেটেপুটে খাচ্ছে। এইবার আয় ক্রাইসিসে। মানুষের বিপদ হল ব্যবসায়ীর সেরা মূলধন। মিডলম্যানের বোলবোলা তার ওপর। মাল চেপে দে। বাজারে হাহাকার। কালোবাজারে মাল বেশি দামে ছেড়ে দে তোর ভাগ্যের হা হা হাসি। জর্দামর্দা ছাড়। লাইন চেন লাইন। হাত বাড়া, গন্ধমাদনের মাথা থেকে বিশল্যকরণী তুলে নে। বেবি ফুড, সিমেন্ট, কেরোসিন, রান্নার গ্যাস, তেল, বনস্পতি, ওষুধ, স্যালাইন, লিস্ট তৈরি কর। এমন কি পাউরুটি। মানুষের ভীষণ প্রয়োজন। না হলে চলবে না। গাড়ির অ্যাকসিলারেটারের মতো চাপবি আর ছাড়বি আর বসে বসে অবাক হয়ে দেখবি তোর দু নম্বরে কালো-মা লক্ষ্মী আকাশের দিকে মাথা তুলছেন। এখন একতলা ভাবতে ভিরমি খাচ্ছিস, তখন দশতলার মাথায় সুইমিং পুল ভাববি। আর আইন? জানবি টাকায় সব কিছু কেনা যায়। আমেরিকা ডলার দিয়ে রাশিয়ার লালদুর্গ কিনে নিলে।

এ সংসারে সার জেনো শুধু এক টাকা।
টাকা বিনা জেনো ভবে সব কিছু ফাঁকা ॥
টাকাতে আত্মীয়-বন্ধু টাকাতে সকল।
টাকা না থাকিলে ভবে জনম বিফল ॥
টাকায় বাড়িবে মান টাকায় রাজত্ব।
টাকার বলেতে হবে সকলে আয়ত্ত ॥

কাঁধে আলতো একটা হাত এসে পড়ল। মাথা ঘোরাতেই সাদা অ্যাপ্রন। সত্যেন। তড়াক করে লাফিয়ে উঠলুম, 'গুড নিউজ সত্যেন?' আমার পেছনে

ভোর হচ্ছে।

সত্যেন আমার দু কাঁধে দু হাত রাখল।

'কি রে? কিছু বলছিস না কেন?'

সত্যেন আমার চোখে স্থির দুটো চোখ রেখে বললে, 'বেয়ার উইথ ইট। সি হ্যাজ এক্সপায়ার্ড।' ডাক্তার সত্যেন। কত রোগী তার হাতে মরে। সেও কেঁদে ফেলল। আমাকে জড়িয়ে ধরে, আমার কাঁধে মাথা রেখে সত্যেন ফুলছে, 'উই ট্রায়েড আওয়ার বেস্ট। যত দূর করা যায়। মেয়েটা বাঁচল না। চলে গেল। প্রসাদ উই ফেল্‌ড মিজারেবলি। শুধু বার্স্ট অ্যাপেন্ডিক্স নয়, দেয়ার ওয়াজ এ সিস্ট। সব কিছু জড়িয়ে একাকার হয়ে বসে আছে। সেই জট আমরা ছাড়াতে পারলুম না। কেন তোরা আগে দেখলি না! ইট ইজ এ কেস অফ লং নেগলেক্ট। প্রসাদ জীবনে আমি কারোকে এত ভালবাসিনি।'

সত্যেন সোজা হল। সত্যেন সরে গেলে। আমি কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। আমার ভিসান চলে গেছে। মুখ দিয়ে কথা সরছে না। কোনো সান্ত্বনা নেই। পিউ ছাড়া বাঁচা যায় না। বাঁচতে পারা যায় না। অসম্ভব।

'সত্যেন তুই আমার একটা উপকার কর। তুই আমাকে একটা ইনজেকসান দিয়ে মেরে ফেল। মেয়েটা একা একা এতটা পথ যাবে কি করে! এতটা পথ!'

আমার চোখ খুলে গেল। জল! জলে কি হবে! শোকের জল, জলের শোক আমার জানা আছে। ঘরে ঘরে অনেকবার অনেক দেখেছি। পনের মিনিট হাঁউমাঁউ। পঁয়তাল্লিশ মিনিট ফুঁপিয়ে। ঘণ্টা তিনেক পরে চা। ঘণ্টা সাতেক পরে কে কোথায় শোবে। একমাস পরে সিনেমা। পিউয়ের চলে যাওয়াটা ওই প্রথায় ফেলতে পারছি না।

সত্যেন হঠাৎ একটা অদ্ভুত কথা বললে, 'নিজেদের খুনী ভাব। সারা জীবন দগ্ধা। এ ছাড়া এই শোক সামলাতে পারবি না। সত্যিই তোরা খুনী। ফুলের মতো একটা মেয়েকে মেরে ফেললি। ওর এই ট্রাবল আজকের নয়। কি অসাধারণ ভদ্রতা বোধ! ওই অবস্থায় আমাকে নমস্কার করেছিল। প্রসাদ, তোরা মানুষ! যাক, যা হবার তা হল। তোর দাদাকে বলিসনি।'

দাদার নাম শুনে ভেতরে আগুন জ্বলে উঠল, 'দাদা! ওই লোকটাকে, ওই অপদার্থটাকে তুই আজই শেষ করে দে। জ্ঞানী সক্রেটিস। সংসার করছে না ইয়ারকি হচ্ছে! তুই গিয়ে চিৎকার করে বলে দে, পিউ নেই। সংসারের মুখে লাথি মেরে চলে গেছে।'

সত্যেন আবার আমার দুকাঁধে হাত রাখল। এইবার তার হাত দুটোর অনেক ওজন। গলা প্রোফেসনাল, 'প্রসাদ, বেয়ার উইথ ইট। কারণের ঊর্ধ্বে আর একটা জিনিস আছে ফেট।' আকাশ ফেটে ভোরের আলো ঝরছে। সাদা আলখাল্লা পরা সত্যেন চলে যাচ্ছে রাতের কাহিনী শেষ করে। দূরে ক্রমশ দূরে।

'কাকু কাল সকালের চাটা তুমি একাই খেয়ো।'

'কাল সকাল কেন পিউ! জীবনের সব সকালের চা-ই একা খেতে হবে।'

'কাকু আমার ছোট ব্যাগের জমানো পয়সা দিয়ে বুলকে একটা বড় রবারের বল কিনে দিয়ো। আর যদি একটু কিছু বেশি লাগে, তুমি দিয়ে দিয়ো।'

'পিউ, তোমার ওই ব্যাগ আর পয়সা সব আমার কাছে থাকবে তোমার স্মৃতি হয়ে। ওগুলো পয়সা নয় পিউ। তোমার মনের মণিমুক্তো।'

শঙ্কর এসে দাঁড়াল, 'প্রসাদদা চলুন। সব ব্যবস্থা করি।'

আমি সংযত এখন। যার যার শোক তার তার শোক। জীবনদানব সব মাড়িয়ে চলে। শোক নিয়ে সিনেমা করতে চাই না। বললুম, 'চলো। অনেক কাজ বাকি।

কবি, আবার প্রিরাফেলাইট স্কুলের চিত্রশিল্পী, গ্যাব্রিয়েল দান্তে রসেটির একটি ছবি দেখেছিলুম, 'ডেথ অফ ওফেলিয়া'। ওফেলিয়া জলে ভাসছে। ফুলে ফুলে তার দেহ ঢাকা। সুন্দর মুখটি শুধু জেগে আছে। আমার পিউ সেই ওফেলিয়া। শহরে যত ফুল আছে, সব ফুল দিয়ে পিউকে ঢেকে দেবো। শুধু মুখটি জেগে থাকবে। সেই কপাল। সোনালি টিপের কপাল। নাক বিঁধিয়েছিল। বলেছিলুম পুজোর সময় ছোট্ট একটা সোনার তিলফুল করিয়ে দোবো। যা বলেছিলুম তা আমি গড়াবোই। খুঁজে বেড়াবো পিউয়ের মতো একটা নাক। যদি চলেই যাবি তা হলে কেন আমাকে ভালবাসার বন্ধনে বাঁধলি!

'শঙ্কর!'

'বলুন দাদা?'

'ওই গানটা একলাইন, দুলাইন গাও তো, কাঁদালে তুমি মোরে ভালোবাসারই ঘায়ে। নিবিড় বেদনাতে পুলক লাগে গায়ে।'

'দাদা আমি যে তবলা বাজাই। আমার তাল আসে সুর আসে না।'

তাহলে আমি গাই।'

শঙ্কর আমার হাত ধরলে, ভাবলে পাগল হয়ে গেছি।

'শঙ্কর, তুমি জানো, তোমাকে দেখার পর আমি কি ভেবেছিলুম! এই চাকরি ছাড়াব। তোমাকে পড়াব, বিলেত পাঠাব। টাকার জন্যে প্রয়োজন হলে ব্যাঙ্ক ডাকাতি করব। তারপর এক মাঘের রাতে তোমার সঙ্গে পিউয়ের বিয়ে দোবো। কি মানাতো তোমাদের দুজনকে! সুন্দর সুন্দর ছেলেমেয়ে হত। ছোট্ট সুন্দর একটা বাড়ি। কিছু ফুল, কিছু সুর, কিছু সুখ, কিছু আশা...'

আমার হাতে শঙ্করের মুঠো দৃঢ় হল। শঙ্করের চোখে জল এল। কনসার্ট কন্ডাক্টার জুবিন মেটার মতো হাতে একটা স্টিক নিয়ে আমার বলতে ইচ্ছে করছিল—ক্রাই! অ্যান্ড ক্রাই।

॥ আট ॥

আমি সেদিন বউদিকে সাঙ্ঘাতিক একটা চড় মেরেছিলুম। 'এই নাও তোমার মেয়ে। তুমি পারবে এইরকম আর একটা মেয়ের জন্ম দিতে!' উন্মাদের মতো এমন সব কথা বলেছিলুম যা কোনো ভদ্রলোক বলে না। এখন তার জন্যে অনুশোচনা হয়। শঙ্কর আমাকে দুহাতে জড়িয়ে ধরে বলছে, 'দাদা, এ আপনি কি করছেন?' বাঙালি জন্মায় দার্শনিক হয়ে। শঙ্কর বলছে, 'আসা-যাওয়া এই তো পৃথিবীর খেলা। কেউ আগে এসে পরে যায়, কেউ পরে এসে আগে যায়!'

পিউ শুয়ে আছে। ফুল আর ফুল। পদ্ম, গোলাপ। দামি ফুল। ধুতুরা ফুল দিয়ে কি বেদনা ঢাকা যায়, শূন্যতা ভরানো যায়! চড় খেয়ে বউদির কিছু হল না। পিউয়ের দিকে পাথরের চোখে তাকিয়ে আছে আর কেবলি বলছে, 'এ কি রে, তুই চলে গেলি। এ কি রে, তুই চলে গেলি।'

বুলের প্রকৃত মা ছিল পিউ। বুল অবাক হয়ে দেখছে আর বলছে, 'দিদি, তুই কোথায় গেলি আর আসবি না। এই তো কাল ছিলিস দিদি!'

দিদি, দিদি, বলে অসংখ্যবার ডাকল। কখন উমা এসেছে দেখিনি, তখনো তার জ্বর। বুলকে জড়িয়ে ধরল। এসে গেল বন্ধু ডিউক। পিউয়ের মাথার কাছে বসল। ঘেউ ঘেউ নেই, লেজ নাড়া নেই। কুকুরও নিঃশব্দে কাঁদে। জীবজগতের এই সংবাদ আমার জানা ছিল না।

হঠাৎ বউদির জন্যে আমার ভীষণ কান্না পেল। মেয়েটার কেউ নেই। এই কন্যাশোক, একটু পরেই স্বামী খঞ্জ হয়ে যাবে। বিভ্রান্ত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কয়েকদিন আগেই কি ঘোর দুশ্চিন্তা, মেয়েটা ভয়ঙ্কর সুন্দরী। রকের ছেলেরা

আওয়াজ দিতে শুরু করেছে। যেমন আকাশে চাঁদ উঠলেই সাইবেরিয়ার তুষার প্রান্তরে নেকড়ের পাল বেরিয়ে এসে চাঁদের দিকে মুখ তুলে উ উ করে সমস্বরে ডাকতে থাকে। ভীষণ দুশ্চিন্তা, পিউয়ের বিয়ের টাকা কোথা থেকে যোগাড় হবে। পিউ যদি বাজে ছেলের সঙ্গে প্রেম করে! সব চিন্তার অবসান।

মনে হল বউদির তো কোনো দোষ নেই। পিউকে অবহেলা করবে কেন? পিউ অসম্ভব বুঝদার মেয়ে ছিল। নিজের শরীরের অসুবিধের কথা বলে বিব্রত করতে চায়নি কারোকে। ডাক্তার বদ্যি অনেক খরচ। অভাবের সংসার। তাই চেপে রেখেছে। একটু আধটু পেট ব্যথা, বউদি ভেবেছে, মেয়ে সদ্য নারীত্বলাভ করছে। প্রথম প্রথম একটু ওরকম হতেই পারে।

পিউ একটা সিস্টেমের শিকার। যে-সিস্টেম সৎ, সজ্জন, নিরীহ, শিল্পী মনোভাবাপন্ন মানুষকে বাঁচার অধিকার দিতে চাইছে না। কত প্রথম সারির শিল্পী, সাহিত্যিক, অভিনেতা কবি দারিদ্র্যের সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলেছেন। এই তো সেদিন পড়লুম, অত বড় অভিনেতা তুলসী চক্রবর্তীর পরিবার দারিদ্র্যের নির্জন শিকার। বাঁচার অধিকার শুধু মজদুরের আর তাদের প্রভুদের। মাঝখানটা মেরে ফেলো, অদৃশ্য করে দাও। হয় তুমি নীচে নামো, নয় তুমি বিশল্যকরণীর পদ্ধতিতে টপে ওঠো। মাস্তানির অ্যাপ্রেন্টিসগিরি করো। কেন আমরা বাঁচার চেষ্টা করছি? ওইটাই তো ক্রিমিন্যাল অফেনস।

বউদিকে ধরলুম, 'চলো যাই, আর কেন? রেখে আসি মহাকালের কোলে।'

মধ্যবিত্তের শোকে অনেক কাব্যিক কথা বেরোয়। বউদির চোখের পাথর ফাটল। তা না হলে বুক ফাটত। উমা এসে বউদিকে দুহাতে জড়িয়ে ধরল। দুঃখের সময় মানুষ মানুষের বুক খোঁজে। সুখের সময় কোল।

মনে মনে বললুম, বউদি গেট রেডি, আর একটা ঘুসি আসছে। ভাগ্য যেন টাইসনের ভূমিকায় নেমেছে। সবই হার্ডপাঞ্চ। প্রতিপক্ষকে রিং-এ দাঁড়াতেই দিচ্ছে না। বুল কাঁদছে, আর একটা করে জিনিস দিদির মাথার কাছে রাখছে, এই নে দিদি, তোর ইরেজার, তোর ডটপেন, তোর রুমাল, তোর বই। তোর টিপের প্যাকেট, তোর কুমকুম, সব, সব নিয়ে যা, কিচ্ছু রেখে যাসনি।

শঙ্কর বুলকে ধরে ফেলল। বউদির ভীষণ কান্না দেখে মনে হল, টাইসনের ভূমিকাটা আমারই নেওয়া উচিত। আমরা যে স্তরের আবর্জনা, আমাদের দুঃখশোকে আচারের আমের মতো জরজর হয়ে থাকাই উচিত। অত মায়া

করে লাভ কি! এই যে বুল, ও এখন থেকে বুঝুক মৃত্যু কাকে বলে, বিচ্ছেদ কাকে বলে। পরিচিত হোক, 'থাকতে থাকতে', 'না-থাকার' সঙ্গে। যে জগতে বাস করছে, সেই জগৎকে চিনুক।

নিজেকে সামলে নিলুম। এক সঙ্গে দুটো ধাক্কায় বউদি হার্টফেল করতে পারে। না থাকাটা বিষাদসিন্ধু, সেই সিন্ধুতে দাদার আধখানা পায়ের শোক বিন্দুর মতো। যখন জানার তখন জানবে।

এক ফাঁকে উমাকে জিজ্ঞেস করলুম, 'কেমন আছ?'

সে বললে, 'প্রসাদদা, আপনার চেয়ে ভাল আছি।'

পিউ চলে গেল। অ্যামাজনে এক ধরনের গাছ আছে। কোনো পতঙ্গ, প্রাণী এসে বসলে ঝপ করে পাতা বন্ধ হয়ে যায়; কিছুক্ষণ পরে যেই খুলে গেল, সব পরিষ্কার, কোথাও কিছু নেই। হজম হয়ে গেছে। জীবন এইরকমই এক স্যাপ্রোফাইট, ঘটনার কীট নিমেষে হজম করে ফেলে। বুকখালি হল, একটা ছাপ পড়ল। জামা থেকে একটা বোতাম ঝরে যাওয়ার মতো। পরতে গেলে মনে পড়ে। একটা ছিদ্র, বাতাস বইলে কান্নার মতো শব্দ হয়। পিউ চলে গেল। নরনারীর মিলনে পল, বিপল, মুহূর্তে লক্ষ লক্ষ জীবের ভ্রূণ তৈরি হয়; কিন্তু মন! ঈশ্বর সেই মালী। মনের চারা নিজের হাতে শরীরে শরীরে লাগিয়ে দিয়ে যান। কোনোটা দানব, কোনোটা ভগবান। মন মানুষের হাতে নেই।

এই যে আমেরিকার উইসকোনসিনে ধামের বলে একটি লোককে পুলিস অ্যারেস্ট করল। শরীরের আকৃতি ভদ্র, চোখ দুটো নিরীহ, শান্ত; কিন্তু মনটা দানবের। শয়তানেরও শয়তান। অভাবী মানুষকে লোভ দেখিয়ে নিজের ফ্ল্যাটে এনে যৌন অত্যাচার করত, তারপর মদের সঙ্গে ওষুধ খাইয়ে ঝিম ধরিয়ে দিত, তারপর গলা টিপে মেরে বৈদ্যুতিক করাত দিয়ে টুকরো টুকরো করত, অ্যাসিড দিয়ে মাংস-চামড়া সব তুলে ফেলত। এই সবের আবার ছবি তুলত অটোমেটিক পোলারয়েড ক্যামেরা। মানুষের অঙ্গ, প্রত্যঙ্গ ভোজন করত। তার ফ্রিজে ছিল তিনটে কাটা মুণ্ড। গত দশ বছরে সে না কি এই রকম সতেরজন মানুষ খুন করেছে। কাহিনীর হ্যানিবলকে বাস্তবে পাওয়া গেল। আফ্রিকার নায়ক ইদি আমিন সম্পর্কেও একই অভিযোগ। এমনই কত শত মানব দানবের মন নিয়ে মানবের সংসারে ঘুরছে।

আরো মজা ছিল। দুঃখেও কি মজা নেই! আছে। বউদিকে বলতে পারছি না দাদার পা বাদ যাবে, আর দাদাকে বলতে পারছি না, তোমার পিউ নেই।

এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা মধ্যিখানে চরের মতো, এ পাশে অভিনয় ওপাশে অভিনয় মাঝখানে আমি। শঙ্কর ভীষণ সাহায্য করছে। উমা হয়ে উঠেছে আমাদের পরিবারেরই একজন। নাকের বদলে নরুন পাওয়ার গল্পের মতো।

দাদার সুগার কমানোর চেষ্টা চলছে ইনসুলিন দিয়ে। বেশ সেজেগুজে হাসিখুশি ভাব নিয়ে দাদাকে দেখতে যাই। পিঠে বালিশ দিয়ে বসে আছে নিয়তির নির্মম শিকারটি। কেবল জিজ্ঞেস করে, 'পিউকে এত তাড়াতাড়ি ছেড়ে দিল রে ? খুব মাইনার অপারেশান ! কি বল ? আর বিলেত ফেরত হাত তো, ভগবানের মতো। পিউ কেমন আছে ? কবে হাঁটাচলা করবে ? কবে আমাকে দেখা দেবে একবার ! তোর বউদিকে একবার আন না।'

কৃত্রিম রাগের ভাব নিয়ে আমাকে বলতে হয়, 'অত হোমসিক হচ্ছ কেন। সব ঠিক আছে। আজকাল বাসট্রামের অবস্থা তো দেখছ ? মেয়েদের আনা এক ভয়ঙ্কর ব্যাপার। তারপর বুল ? বুল কার কাছে থাকবে ! তোমাকেও তো এইবার ছেড়ে দেবে। সুগার কমিয়ে তোমার পায়ে নামবে। পাটা ঠিক হয়ে গেলেই বাড়ি।'

'টাকাপয়সা ম্যানেজ করছিস কি ভাবে ?'

'ওটা আমার ভাবনা তোমাকে ভাবতে হবে না। খুব শিগগির আমি ভীষণ বড়লোক হয়ে যাচ্ছি।'

দাদা খুব উল্লসিত হয়ে বলেছিল, 'কি ভাবে ? তাহলে কিন্তু বেশ হয়। বাড়িটা দোতলা করে ফেলবি। পিউ আর বুলকে একটা ভাল স্কুলে ভর্তি করাও যাবে। দেনাগুলো সব শোধ হয়ে যাবে। কি ভাবে হবি ?'

'ওই যে আমার মুরুব্বি নিঃসন্তান মহিমদা, বয়েস হয়েছে, আমাকে তার বিশাল ব্যবসার ওয়ার্কিং পার্টনার করছে। প্রথমে ভেবেছিলুম, কি দরকার। লোভ ভাল নয়। বড়র পিরিতি বালির বাঁধ, ক্ষণে হাতে দড়ি ক্ষণে চাঁদ।'

দাদা বলেছিল, 'বাবার মতো বোকামি করিসনি। ক্ষমতাশালী, অর্থবান লোকের দয়া ছাড়া জীবনে দাঁড়ানো যায় না মাস্তু। তুই যখন বড় হবি যখন আরো অনেককে সাহায্য করতে পারবি। মনে আছে সুধন্য তোকে কি রকম অপমান করেছিল !'

মনে আবার নেই। ভোলা কি যায় সহজে ! শরীরের ক্ষত কয়েকদিনের মধ্যে শুকিয়ে যায়, মনের ক্ষত আজীবন থেকে যায়। মনের ভীষণ সুগার। আমাদের বাড়িতে যে বউটি কাজ করত, তার মেয়ের বিয়ে। চাঁদা তুলেও কুল পাওয়া যাচ্ছে না। সুধন্যর কথা মাথায় এল। বেলুনের মতো বড়লোক।

সামান্য হাজার খানেক দিলেই হয়ে যায়। একবার ইলেকসানে দাঁড়িয়েছিল। বিধানসভা প্রায় ধরে ফেলেছিল। আর সাতশো সাঁইত্রিশটা মুণ্ডু কাটতে পারলেই হয়ে যেত। তখন সুধন্য নাদুসনুদুস শরীর নিয়ে, হাত জোড় করে পাড়ায় পাড়ায় ঘুরেছিল। মাসীমা, দিদিমা, কাকীমা, পিসীমা, মামীমা, দাদা, দিদি বউদি, ভাই, বোন, আমি সেবা করতে চাই, আমাকে একটু সুযোগ করে দিন। আপনারাই আমার তারকনাথ। বাবা তারকনাথের চরণের সেবায় লাগি মহাদেব। সেই দেশসেবী সুধন্য সরকারের কাছে অনেক আশা নিয়ে গেলুম। ভুরু তুলে তাকাবার কি ধরন, যেন ভগবান, নিচু তলার প্রাণীদের দিকে অতিশয় বিরক্তি নিয়ে তাকাচ্ছেন। চেয়ারে এলিয়ে বসে আছে ইউনিফর্ম পরে। এখন তো পার্টিও ফুটবল টিমের মতোই। ইস্টবেঙ্গল, মোহনবাগান, মোহাম্মাডান, সব দলেরই জার্সি আছে। এঁর জার্সি, চুস্ত পাজামা, হাইনেক পাঞ্জাবি। কোলের কাছে পাঞ্জাবির তলায় জলভরা একটা ব্লাডার। সেটা সুধন্যর ভুঁড়ি। যে যাই বলুক এ দেশের নেতা, বড়মানুষ ; পুলিস আর ধর্মগুরুদের ভুঁড়ি ছাড়া মানায় না। দেশের জন্যে কষ্ট করায় সামান্য খামতি থাকলে ওই ভুঁড়ি বহন করার পরিশ্রমে তা সেন্টপারসেন্ট হয়ে যাবে। সুধন্যর একটা হাত চেয়ারের পেছন দিকে ঝুলছে। দেহটা যতটা সম্ভব এলিয়ে টেবিলের মাঝখানে ভুঁড়িটার স্পেস করে দিতে হয়েছে।

ইলেকসানের আগে বেশ টেনেটেনে সুর করে বলত, কি চাই ভাই ?

ইলেকসানের পর যেন গুলতি ছুঁড়লে, কি চাই !

এই সব নেতাদের তো আজ দেখছি না। রকমসকম সব জানা। কিছু মনে করতে নেই। আর গরিবদের মানসম্মান থাকা উচিত নয়। তোর যখন ব্যাটা কিছুই নেই তখন মানসম্মানই বা থাকবে কেন ! যাই হোক সামান্য কথা, গোছগাছ করে বলতে বেশি সময় লাগল না।

সুধন্য সরকার সামান্যতম দরদ না দেখিয়ে বললে, শোনো, তোমাকে একটা স্পষ্ট কথা বলি, তোমার যথেষ্ট বয়েস হয়েছে। ভিক্ষে করে সমাজসেবা হয় না। তুমি এক ভিখিরি, তুমি সাহায্য করতে চাইছ আর এক ভিখিরিকে। ক্ষমতা থাকে নিজের ট্যাঁক থেকে দাও। আর তা না হলে সরাসরি তাকে আমার কাছে পাঠাও। আগে আমি রঙ চিনি। আমেরিকায় যেমন সাদা কালো, এখানে সেই রকম লাল সাদা। তুমি মাঝখানে বসে নেপোগিরি করছ কেন ? নেতা হবার শখ হয়েছে !

বলেছিলুম, নেতা হবার মতো চরিত্রদোষ আমার নেই।

তোমাদের ওসব বাঁকা কথা আমার গায়ে লাগে না ছোকরা। সরে পড়ো।

তা ঠিক, ভোট একটা ফুটবল। ভাল কোচের ট্রেনিং-এ গোটাকতক চিমার মতো প্লেয়ারকে ফরোয়ার্ড লাইনে রেখে খেলতে পারলে টুর্নামেন্ট জয় অবধারিত। পরে অবশ্য নিজের ভুল বুঝতে পেরেছিলুম। ঠিক মতো হ্যান্ডল করতে পারিনি। ক্ষমতাশালী, পয়সাঅলা লোকেরা সালফিউরিক অ্যাসিডের মতো। বেসিন, কমোড, প্যানের ময়লার মতো আমাদের দারিদ্র্যের ছোপ লহমায় দূর করে দিতে পারেন। নাকে হয়তো কিছু ফিউমস লাগতে পারে। কিন্তু ঠিক মতো জায়গামাফিক ফেলতে হবে। বোতলটা সাবধানে ধরতে হবে। অসাবধান হলেই হাত-পা পুড়ে যাবে।

সেই সুধন্য সরকার। দাদা হঠাৎ স্মরণ করিয়ে দিল। রিভলভার ঠেকিয়ে চাঁদা চাইলে ব্যবসায়ী সুড়সুড় করে পঞ্চাশহাজার নামিয়ে দেবে। গরিব ভয় পেলে মলমূত্র নামায়। অর্বুদপতি সওদাগর নামায় টাকা। বিশল্যকরণী বলেছিল, পৃথিবীতে একটা জিনিস যে চিনেছে, সে মেরে দিয়েছে কেল্লা। মা, বাবা, ভাই, বোন, ভগবান নয়, স্বার্থ। পাল্টা তোর উপনিষদ। আত্মানং বিদ্ধি নয়। মডার্ন মাল হল, স্বার্থনাং বিদ্ধি। অ্যাকর্ডিং টু ঝোপ, মারো ইওর কোপ।

এ পাশে ঝোলা, ওপাশে ঝোলা, হাঁটতে হাঁটতে, মাঝে মাঝে মনে হয় আমি নয় পৃথিবীটাই ক্ষয়ে গেল। হাজার বছর ধরে আমি পথ হাঁটিতেছি পৃথিবীর পথে। বনলতা সেনের জন্যে নয়, ভাগ্যলক্ষ্মীর জন্যে। বাসে ট্রামে ট্রেনে ঝুলতে ঝুলতে নিজেকে আর মানুষ বলে মনে হয় না। মনে হয় একটা ছাতা। হুকে ঝুলছি। কখনো কখনো মনে হয় মাংসর দোকানের ঝোলা পাঁঠা। মনে হয় সেই জন্যেই একটু লোভ আসছে। জীবন তো ফুরিয়ে এল। একটা একটা করে দিনের দেশলাই কাঠি জ্বালছি আর ঝোড়ো বাতাসে নিবে যাচ্ছে। একটা প্রদীপও জ্বালানো হল না। আর মাত্র গোটাকতক কাঠি পড়ে আছে। ড্যাম্প লেগে গেছে। খোলের গায়ের প্রাণশক্তির বারুদ ঘষা লেগে লেগে প্রায় উঠেই গেছে।

বড়লোক হওয়ার জন্যে নয়, আংটিটা বেচার জন্যে মহিমদার দোকানে যেতেই হবে। সত্যেন বলেছিল ফার্স্ট কেসটা আমার। একটা পয়সাও তোকে দিতে হবে না ; কিন্তু দাদারটা তোর খরচ। মহিমদার দোকানে মহিমদা নেই। বিশাল ভারিক্কি চেয়ারটা খালি।

কর্মচারীরা বললেন, 'সে কি আপনি কাগজ দেখেননি ? বাবু তো মারা

গেছেন। এই তো গত সপ্তাহে শ্রাদ্ধ হয়ে গেল।'

রাগের চোটে মুখ ফস্কে বেরিয়ে যাচ্ছিল, মারবো শালা এক লাথি। সামলে নিলুম। আর কি ? আর তো কোনো কাজ বা প্রশ্ন আমার এখানে থাকতে পারে না। টাইসন আবার একটা ঘুসি আমাকে হাঁকিয়েছে। এখন আর আমার কোনো প্রত্যাশা নেই। এখন বেদনা। মহিমদার সঙ্গে আমার আজকের পরিচয় নয়। পরিচয় অনেক কালের। প্রথম আলাপ কাশীতে। বাঙালিটোলায়। ঘরকাঁপানো হাসি, দিলদরিয়া মেজাজ। অতীতকালের বড় মাপের, বড় হৃদয়ের বাঙালির এক স্যাম্পল। বেনারস মাতিয়ে বসে আছেন। একালের কলে পড়া লেংটি ইঁদুর নয়। ফ্রিজ থেকে এঁটো কাঁটা বের করে খায়। 'ডালটা তুমি তা হলে আর খাবে না প্রসাদ ?' 'তুলতুলি ফ্রিজে ঢুকিয়ে দাও।' ক্যাটারার জিজ্ঞেস করছেন, 'আপনার লোকের এস্টিমেট কতো ?' 'শ তিনেক।' 'ভাল করে জমাতে হলে পার প্লেট ষাট।' 'ও বাবা মরে যাবো। ছেলের বাপকে সব দেওয়ার পরও পঞ্চাশ হাজার নগদ দিতে হয়েছে।' 'ছেলের বাপ বলছেন কেন ? বলুন জামাইকে।' 'ওই হল। বিয়ে করে ছেলে, দই খায় বাপে।' 'তাহলে লোক কমান।' 'অসম্ভব। ছেলের বংশ কচুরিপানার বংশ। আপনি কমান।' 'একটা রাস্তা আছে। ফিশ ফ্রাইতে রিয়েল ভেটকি যদি না দেন।' 'আনরিয়্যাল আছে না কি !' 'বাঃ ইমিটেশান নেই। সবেরই ইমিটেশান আছে। অমিতাভ বচ্চনের ইমিটেশান বেরিয়ে গেল। হাঙরের ফ্রাই লাগিয়ে দিন।' 'যে হাঙর মানুষ খায় !' 'আজ্ঞে হ্যাঁ, হাঙর যেমন মানুষ খায়, মানুষও তেমনি হাঙর খায়। মানুষ খায় না এমন জিনিস পৃথিবীতে নেই। কাকের জাত। রেস্তোরাঁয় যে ফ্রাই খান সেটা কিসের !' ফ্ল্যাট সিস্টেম, প্লেট সিস্টেম, কোটা সিস্টেম, বাঙালির এখন সবই সিস্টেম। মহিমদা ছিলেন সেই সাবেক কালের বাঙালি। নিয়ে যা, নিয়ে যা, খেয়ে যা, খেয়ে যা, ছাড়া আর কোনো কথা ছিল না।

আমাকে যারা ভালবাসবে তারা মরবে। এই আমার ফেট। খুব শিক্ষা হয়েছে। জীবনের কাছ থেকে আর আমি কোনো কিছু আশা করব না। জীবন আমাকে কিছু দেবে না, শুধু নেবে। তা সেও তো ভাল। আমি দাতা আর ভগবান ভিখিরি।

মহিমদা বুঝেছিল মৃত্যু আসছে। হার্ট যাদের বড় তাদেরই বুঝি হার্ট অ্যাটাক হয়। হৃদয় খুলে দিলে পাখি আর কতদিন থাকবে মহিমদা ! আমার ফ্রেন্ড, ফিলজফার, গাইড তুমি চলে গেলে ! জানতেই পারলুম না নিজের জালগোলের

জন্যে ! যাক, সবই যাক্ । জুয়াড়ি যখন দানের পর দান হারতে থাকে রোখ বেড়ে যায় । তখন আরো বড় বড় বাজি ধরে । দ্রৌপদীকেই ধরে দেয় । কিন্তু আংটিটা তো বিক্রি করা যাবে না আর ! মহিমদার স্মৃতি । রুবির মতোই লাল, উজ্জ্বল এক মানুষ !

পিউ যখন ছিল, মনে হত কখন বাড়ি ফিরব ! ইদানীং মনে হয়, মরেছে বাড়ি ফিরতে হবে ! বাড়িটা ছিল পিউময় । সামান্যকে নিয়ে কত ভাবে একটা পরিবারকে মাতিয়ে রাখা যায় পিউ তা দেখিয়ে গেছে । এখন মনে হয় এত শূন্য আকাশও হার মানবে । সর্বত্র পিউয়ের হাতের স্পর্শ । হাতের কাজ, সেলাই, ছবি, পাপোশ ঝালর, ছোট ছোট ডেকরেশন । স্কুল থেকে পাওয়া প্রাইজ । ব্যবহৃত জিনিস । লেডিজ রুমাল । বইয়ের ভেতর কুড়িয়ে পাওয়া রঙিন পালক । ইচ্ছে করে আমার সঙ্গে ঝগড়া করত । 'চাটা খেয়ে নেওয়া হোক । পিউ ছাড়া কে আর চা করে দেবে । দেখিস চা, তোর মধ্যে আবার দাড়ি কামাবার বুরুশ ডুবিয়ে না দেয় ! বাবুর তো অনেক গুণ ।'

সকালটা একেবারে অসহ্য লাগে । নিজেকে একটা কাক মনে হয় । ঝামা ঘষা গলায় ডাকছি । আকাশটাকে মনে হয় লোহার পাত । মানুষগুলো সলিড । চোখে সব হলুদ দেখি । কিন্তু কিছুই করার নেই । মেহেরবান লিখেছেন নাটক । আমরা অভিনেতা ।

বুল একটা শর্টস পরেছে । হাতকাটা স্যান্ডো গেঞ্জি । হাত দুটো মুঠো করে, শক্ত শক্ত পা ফেলে একবার এদিক যাচ্ছে, একবার ওদিক । যেন সত্যিই পালোয়ান । এখনি ঝাঁপিয়ে পড়বে প্রতিপক্ষের ঘাড়ে । হঠাৎ আমার সামনে চলে এল, 'শোনো কাকু তোমার ভীমপহেলবানের চেলা হয়ে কোনো লাভ নেই । আমরা হেরে গেছি । ভগবান ফ্যাঁস করে ছুরি চালিয়ে দিদিকে ফিনিশ করে দিলে । কিছু করতে পারলুম না কাকু । তুমি এইবার বেনারসে গিয়ে, আর একজন ভীষণ বড় পহেলবান খুঁজে বের করো ।'

বুল আরো রেগে রেগে পায়চারি শুরু করল ।

দূরে দেখতে পাচ্ছি, বউদি কি একটা মাজছে ছাই দিয়ে । ঘষছে তো ঘষছেই । কতদিন চুল বাঁধেনি । হঠাৎ উমা এল । এসেই বউদির পাশে বসে পড়ল । পিঠে হাত বোলালো । উমা সময় পেলেই আসে । যতক্ষণ থাকে বউদির মনটা একটু ঘুরে যায় । মেয়েদের মন আলাদা একটা ধাতু দিয়ে তৈরি । অসীম সহ্যশক্তি । শুনেছি, বাজ কলাগাছে পড়লে কাবু হয়ে যায় । মেয়েদের মন সেই কলাগাছ ।

উমা এক ফাঁকে এসে কানে কানে বললে, 'আজ তো ?'

'হ্যাঁ আজ !'

সত্যেন ডাক্তার আমার আগেই এসে গিয়েছিল । এখন শঙ্করের ডিউটি নয় ; তবু সে আমার সঙ্গে এসেছে । বয়েস কম । পরপর দু'রাত জাগলেও কিছু হবে না । সত্যেন বেরিয়ে এল অপারেশান থিয়েটার থেকে ।

'একটু দেরি করেছিস । চল, একটা বন্ড সই করতে হবে ।'

সই করতে করতে মনে হল আমিই ঘাতক । 'সত্যেন এত উন্নতি হয়েছে, কোনোভাবে বাঁচানো যায় না পাটাকে ।'

'এখন আর আমাকে বিচলিত করিসনি । তুই ভাবছিস পায়ের কথা, আমি ভাবছি মানুষটার কথা । ব্যাপারটা খুব সহজ ভেবো না । গ্যাংগ্রিন প্লাস সুগার প্লাস লো প্রেসার প্লাস হার্ট ট্রাবল । তুই অপারেশান থিয়েটারের বাইরে ওই বেঞ্চে বোস । ইফ এনি থিং হ্যাপ্‌নস, আমি তোকে ডাকব । আমি ভাই কোনো গ্যারান্টি দিতে পারছি না ।'

বসে আছি । শঙ্কর আমার পাশে । শঙ্করের কাছে অপারেশান কোনো ব্যাপার নয় । আমার কাছে, এটা একজন মানুষের অঙ্গচ্ছেদ নয়, একটা পরিবারের অঙ্গচ্ছেদ । মনটাকে ঘোরাবার চেষ্টা করছি । পিউকে ভাবছি । পিউ, উমা, বউদি পুজোর বাজার করতে যাচ্ছে । শরতের আকাশ ঝলমল করছে আমার শৈশবের রোদে ।

প্রতিমার কাঠামো বাঁধা হচ্ছে । তৈরি হচ্ছে ডাকের সাজ । বর্ষার ভিজে বাড়ির দেয়ালের জল শুকোচ্ছে । রঙের জেল্লা ফুটছে আবার । ছায়া বড় হচ্ছে, গভীর হচ্ছে । চামড়ায় টান ধরছে । 'প্যাঁজা তুলো' মেঘের মতো, প্রিয়জনের দেশে ফেরা চিঠির মতো ফুরফুরে সুখ । দেশে রাজনীতি নেই, খুন জখম রাহাজানি নেই । সব মানুষ আবার আগের মতো হয়ে গেছে । রাস্তাঘাট মেরামত হয়ে গেছে । দর্জির কল চলছে ঊর্ধ্বশ্বাসে, গলায় দুলছে ফিতে । স্যাকরার হাতুড়ি ঠোকার শব্দ । পুজোর প্যান্ডেল বাঁধা হচ্ছে । বাঁশের ওপর ঝুলছে বিড়ি ঠোঁটে লোক । নতুন সিনেমার পোস্টার পড়েছে । আখের গোছা কাঁধে নিয়ে বিক্রেতা হাঁকছে, আখ চাই । আখ । ধুন্ ধুন্ করে তুলো ধুনছে ধুনুরি । আইসক্রিমের ঠেলাগাড়ি গুড়গুড় করে যাচ্ছে । পিউ স্কার্ট পরেছে । মেমের মেয়ের মতো দেখাচ্ছে । উমার ঝকমকে শাড়ি । কাঁচ থেকে দারিদ্রের বাষ্প সরে গেছে । অনেক আলো, আলো আর আলো, কাল গভীর রাতে অলৌকিক এক শল্যচিকিৎসক কুচ করে সেই বিশ্রী টিউমারটি কেটে দিয়ে

গেছে। আমরা সবাই এখন ভীষণ সুস্থ। বউদির কুচকুচে কালো এলো চুলে রোদের জরি।

হঠাৎ অপারেশান থিয়েটারের অ্যালুমিনিয়ামের দরজাটা খুলে গেল। ভুস্ করে বেরিয়ে এল হিমালয়ের ঠাণ্ডা। বেরিয়ে এল একটা ট্রলি। চোখের সামনে দিয়ে বেরিয়ে গেল আস্ত একটা কাটা পা। দাদার পা। আমি একটা পোড় খাওয়া শক্ত মানুষ। আমার মাথাও ঘুরে গেল। আমি শঙ্করকে জড়িয়ে ধরলুম। ভয়ঙ্কর এক আতঙ্ক। প্রত্যঙ্গ যখন অঙ্গে থাকে তখন কিছুই না। দেহবিযুক্ত হলেই ভয়াবহ।

শঙ্করের স্বভাব উমার মতোই। ভীষণ কোমল। আমাকে অনেকক্ষণ ধরে রেখে নিজের মনেই বললে, 'দয়ামায়া নেই। এই ভাবে খোলা কেউ নিয়ে যায়!' চোখ বুজে আছি আমি, সেই ভাবেই জিজ্ঞেস করলুম, 'কি করবে ওটাকে?'

'ডেস্ট্রয় করে ফেলবে। যন্ত্র আছে।'

কিছুক্ষণের মধ্যে বেরিয়ে এল অচৈতন্য দাদা। বেডে নিয়ে যাচ্ছে। পেছনেই সত্যেন। সত্যেন হাসছে। সাফল্যের হাসি। সত্যেনের কাছে এটা সাকসেস। সাফল্যের সংজ্ঞা এক একজনের কাছে এক এক রকম। ইরাককে চূর্ণ বিচূর্ণ করে বুশ হাসছেন। পরাজিত সাদ্দাম বিমর্ষ হয়ে বসে আছেন।

ময়দানে আমার একটা গাছ আছে। সেই গাছের তলায় গিয়ে বসলুম। দাদা এখনো জানে না, কি হয়ে গেল! যখন জানবে? দূরে ফুটবল খেলা হচ্ছে। দাদা একসময় ভাল ফুটবল খেলত। ভীষণ ভাল সাইকেল চালায়। সেলাইকলে পা চলে সাঙ্ঘাতিক। পয়সা বাঁচাবার জন্যে মাইলের পর মাইল হাঁটে। পথ চলে না পা চলে? আর তো ভাবা যায় না। আমি বাড়ি ফিরে বউদিকে কি বলব? যদি আর না ফিরি! আমার তো কোনো কিছুই নেই। জর্দাঅলা প্রসাদের সমস্যাটা কোথায়। এত বড় পৃথিবী একা একটা লোক। বাবা যাবার সময় বলে গেলেন, তোদের জন্যে অনেক রেখে গেলুম, মাইনাস বিশ হাজার। সেই দেনা দাদা আর আমি প্রায় না খেয়ে শোধ করেছি। দাদার সুগার হবে না তো কার হবে! মাছ, মাংস, ডিম নেই। ডাল, ভাত, আলুভাতে আর দুশ্চিন্তা, শরীরে চিনির কল খোলার পুরো আয়োজন। প্রোডাকসানও ভাল। হাওড়ায় গিয়ে বেনারাসের একটা টিকিট কাটি। রাত সাড়ে আটটায় একটা ট্রেন আছে। প্রসাদ নেই। তারপর? অসহায় বউদি, বুল, দাদা, একটু একটু উমা। পালাবো? প্রসাদ পালাবে! কবিতাকে যারা ভালবাসে তারা

জীবনকেও ভালবাসে। তারা পালাতে পারে না। মরার পর তারা আবার ফিরে আসতে চায়,

আবার যেন ফিরে আসি
কোনো এক শীতের রাতে
একটা হিম কমলালেবুর করুণ মাংস নিয়ে
কোনো এক পরিচিত মুমূর্ষুর বিছানার কিনারে।

সবার আগে চাই টাকা, সেই বিশ্রী কাগজ চাই এক গাদা। আমার গাছ। বাতাস নিয়ে দুলছে মাথার ওপর। ছায়া নিয়ে খেলছে নীচে। সমস্যা নেই, শেকড় আছে, পৃথিবীর অধিকার আছে পায়ের তলায়। গাছ আর আমাকে কি পরামর্শ দেবে!

হঠাৎ একটা নৃশংস চিন্তার ঢেউ খেলে গেল। আরে পিউ তো এখন নেই, তা হলে আর ভয় কি, দাদার প্রভিডেন্ট ফান্ড ভাঙা যায়। দশ বছর চাকরি আছে। তার মধ্যে বুলটাকে পিটিয়ে মানুষ করে দোবো। আমি আর এক নেতার কাছে যেতে পারি। বলতে পারি, এই দেখুন রামভক্ত হনুমানের মতো বুক চিরে দেখাচ্ছি, আপনার মতবাদের মন্ত্রগুরু বসে আছেন বুকে।

তিনি হাসবেন, ক্রিস্টাল লাফ, 'শোনো প্রসাদ ওটা তোমার ব্যক্তিগত সমস্যা। জাতির সমস্যা নিয়ে এসো, লড়ে যাচ্ছি।'

'অনেক ব্যক্তি নিয়েই তো দেশ, তা হলে ব্যক্তিকে বাদ দেবেন কি করে!'

হিন্দি সিনেমার ছিনাল নায়িকার মতো তিনি বলবেন, 'পাগল কাহিকা। সমস্ত মানুষের সমস্যা নিংড়ে একটা রস বের করো, তারপর সেটাকে ইভাপোরেট করো, যে রেসিডিউ পড়ে রইল সেটা কি! মানি। টাকা। টাকা মানে জীবিকা। জীবিকা মানে? কলকারখানা, কৃষি, ব্যবসা, উৎপাদন, ক্রয়-বিক্রয়, মাল চলাচল, ট্রান্সপোর্ট, রেল রোড। তার মানে আবার টাকা। সেই টাকা কে দেবে ভাই? দেবে কেন্দ্র। তার মানে? যেতে হবে কেন্দ্রে। কেন্দ্রকে কব্জা করতে হবে। ভয়ঙ্কর রকমের একটা মাস্টার প্ল্যান তৈরি করতে হবে। সেই প্ল্যানের মধ্যে আসবে স্টেট। ধীরে ধীরে জীবিকা তৈরি হবে। এমপ্লয়মেন্ট ফর অল। তখন তো অটোমেটিক সমস্ত সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে বুঝতে পারছো ব্যাপারটা! ওপর থেকে নামতে হবে, নীচে থেকে উঠতে হলে ব্যাপারটা হয়ে যাবে ব্যক্তিগত। মগে করে একটা গাছের গোড়ায় জল ঢালা হল ফ্যাশানেবল হর্টিকালচার। ঝরঝর বৃষ্টি হল অ্যাগ্রিকালচার। মাঝখান থেকে বিজেপি ঢুকে কেস ক্যাঁচাল করতে চাইছে। তুমি ফিরে এসে দেখবে সব

ঠিক হয়ে গেছে। পরের বার যখন জন্মাবে দেখবে নো প্রবলেম।'

॥ নয় ॥

দাদা ফ্যাল ফ্যাল করে আমাদের দিকে তাকিয়ে বালিশে হেলান দিয়ে বসে আছে। নীচের দিকটা চাদর চাপা। মুখটা শীর্ণ। চোখে জল। আমি, উমা, বউদি বসে আছি। কিছু বলার নেই।

দাদা হঠাৎ বললে, 'কি কাণ্ড দেখ, তোর বন্ধু ডাক্তার আমাকে অজ্ঞান করে, আমার অমন সুন্দর পাটা কেটে নিয়ে চলে গেল। আমি তো জানি না। জ্ঞান হল। পাটা তুলতে গেলুম। দেখি, নেই। সে কি রে, আমার পা নেই! বিশ্বাস হল না। ভাবলুম স্বপ্ন। তারপর দেখি, না জেগে আছি। আবার চেষ্টা করলুম। দেখি কি, একপাশের চাদরটা উঠল, আর এক পাশ উঠল না। পড়ে রইল। নেই। সেই নেইটাই কি সাঙ্ঘাতিক ভাবে আছে দেখ! বাকি জীবন এই ভয়ঙ্কর নেইটাকেই বয়ে বেড়াতে হবে। একটা আছে একটা নেই। দুটোই সত্য। কত হাঁটালুম, কত খেলালুম, ছোট থেকে কত বড় করলুম, আজ ছেড়ে চলে গেল অকৃতজ্ঞের মতো। ভগবানের কোনো বিচার নেই।'

আমরা সবাই চুপ। দাদা কাঁদছে। নেইটাই সত্য। আছেটা মায়া। এ আমিও বুঝেছি। পিউ নেই। নেইটাই আছে। আমার সঙ্গে সঙ্গে চলবে, আমার বুকের খাঁচায় ভয়ঙ্কর রকমের একটা নেই। মহিমদা নেই। নেইটাই আছে। নেইটাই থাকবে। সন্দেহ হয়েছিল, গৌরাঙ্গদার খবর নিতে গিয়েছিলুম। নেই। এখন নেইটাই আছে। যেদিন আমি থাকবো না, সেদিন কিছুই থাকবে না। আমিও একদিন নেই হব। হবই হব। 'আছেটা' ভীষণ আপেক্ষিক। চরম সত্য হল 'নেই'। সেই 'নেইয়ের' মধ্যে একটা সাময়িক 'আছে' বুদ্বুদের মতো ফুটছে ফাটছে।

দাদা হঠাৎ জিজ্ঞেস করলে, 'পিউ এল না! সে কেমন আছে? বুলকে বুঝি তার কাছে রেখে এলে?'

বউদির মুখ ছাইয়ের মতো সাদা হয়ে গেল। উমা ঢোঁক গিলল। আমার গলা শুকিয়ে গেল।

দাদা বললে, 'ওর আর কোনো কমপ্লেক্স নেই তো? চেহারাটা একটু ফিরেছে?'

আমি একটা অদ্ভুত কথা বললুম, 'দাদা, তুমি এখন নিজের কথা ভাবো।'

'আমার কথা আর ভেবে কি হবে? খঞ্জ মানুষ সকলের কৃপার পাত্র।'

'পৃথিবীতে কয়েক কোটি খঞ্জ মানুষ আছে দাদা। তারা সবাই বহাল তবিয়তে বেঁচে আছে। এই স্প্যান পত্রিকায় সেদিন বেরিয়েছে। আমেরিকায় এক ভদ্রলোক, হাঁটুর কাছ থেকে দুটো পা নেই, কৃত্রিম পা লাগিয়ে ভদ্রলোক ছুটছেন। দক্ষিণী অভিনেত্রী সুধা চন্দ্রন কৃত্রিম পা লাগিয়ে আবার নাচের জগতে ফিরে এসেছেন। আমাদের পাড়ার নাগেশ্বরের কথা নিশ্চয় মনে আছে।'

দাদা অসহায়ের মতো বললে, 'সকালে বাথরুমের প্যানে বসব কি করে?'

এই হল মানুষ! তার সুখ-সুবিধার বোধ কত ছোটখাটো সমস্যাকে ঘিরে ঘুরপাক খায়! পায়ের সম্পর্ক তো পথের সঙ্গে। পা চলবে, পথ গুটোবে। একদিন দেখা যাবে, আরো অনন্ত পথ সামনে পড়ে আছে, আমার চলাটা নেই। আমি উবে গেছি। যাঁরা পারেন তাঁরা দেহবিযুক্ত কর্মটি ফেলে যান, সেই কর্ম এগিয়ে যায় আরো, দুশো, তিনশো, পাঁচশো বছরের পথ, যুগ থেকে যুগান্তর। তাঁরা মহাপুরুষ, যেমন, বুদ্ধ, শ্রীচৈতন্য, রামকৃষ্ণ, রবীন্দ্রনাথ, শেকসপীয়ার।

হঠাৎ দাদা বললে, 'তোরা আমাকে ঘৃণা করবি, উপহাস করবি, ব্যঙ্গ করবি, উপেক্ষা করবি, অবহেলা করবি, করুণা করবি?'

আমরা তিনজনে প্রায় একই সঙ্গে মুখ নিচু করলুম। এমন কথায় চোখে জল আসবেই। আজ আসছে, কাল আসবে না। আজ পরিবেশ বড় বিষণ্ণ কোমল; কিন্তু দাদা একটা তীব্র সত্য ছুঁয়ে ফেলেছে। সংসারের অন্তরের নিষ্ঠুর মনটিকে। একেবারে নেই তার এক মর্যাদা, একটুখানি আছে সে এক করুণ অবহেলা। দুপায়ে দাদা যা দিচ্ছিল, এক পায়েও দাদাকে তাই দিতে হবে, পারলে একটু বেশি। সংসার দেওয়ার জায়গা। যে যা পারো পরস্পর পরস্পরকে দিয়ে যাও। গাছ, ফল, নদী, গরু। শুকিয়ে গেলে স্মৃতিতেও স্থান নেই। শঙ্করকে বলেছিলুম, যে-ভাবেই হোক টাকা যোগাড় করে এইখানেই তোমার মায়ের অপারেশান করাব। সংসারটাকে আবার ট্র্যাকে তুলব।

শঙ্কর কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলেছিল, যে-ঘোড়া হারবেই তার ওপর বাজি ধরতে নেই। মায়ের হয়েছে ক্যানসার। ক্যানসার কখনো সারবে না। অকারণে খরচ করার মতো বড়লোক আমরা নই প্রসাদদা। অনেকে লোক দেখাবার জন্যে অনেক কিছু করে। মা বেশ আছে যদ্দিন আছে। খোঁচালেই মৌচাকে ঢিল। আর বাবা ওই রকমই থাকবে, সাক্ষীপুরুষের মতো

নারায়ণশিলার মতো। এই রকমই হয়, আরো কত সংসার এই রকম হয়ে আছে। সংসারও একটা গাছ, তার চারা বেরোয়, চারা-গাছ হয়। সংসার একটা রিলে রেস।

শঙ্কর খপ্ করে আমার হাত চেপে ধরে বললে, দিদি আপনাকে ভীষণ ভালবাসে। আপনি আমাদের বাড়িতে আসার আগেই একদিন আমাকে বলেছিল, ওই দেখ্ ঠিক আমাদের মতোই একজন যাচ্ছে। ব্যাগ হাতে, একপাশে হেলে গেছে; কিন্তু ভেতরটা ভীষণ সোজা, নারকোল গাছের মতো। আপনি পারেন তো দিদিকে ওই কবর থেকে বের করে নিয়ে যান। কিছু দিন অন্তত বাঁচুক।

দাদা হঠাৎ বললে, 'এই মেয়েটি তো বেশ। এ কে!'

বউদি একটু কথা বলার সুযোগ পেলে। উমার পরিচয় দিলে।

দাদা বললে, 'মনে হচ্ছে আমাদের পরিবারেরই একজন।'

উমা উঠে গিয়ে, দু হাত দিয়ে দাদার শীর্ণমুখটা তুলে ধরে, সেই চোখ কোঁচকানো অদ্ভুত হাসি হেসে তার অসাধারণ গলায় বলল, 'দাদা, আপনি অত ভাবছেন কেন, অত ভেঙে পড়ছেন কেন?'

একটা সুন্দর মুখ, একটা সুন্দর হাসি মানুষের কত দুঃখই যে ভুলিয়ে দিতে পারে! সেইজন্যেই তো পৃথিবীতে আসা। মানুষ কি দেহে বাঁচে? মানুষ বাঁচে অনুভূতিতে।

দাদা বললে, 'তুমি বলছ? বেশ, তাহলে ভাঙব না।'

উমা বললে, 'আমরা সবাই তো আছি আপনাকে ঘিরে।'

এক সময় আমাদের উঠতে হল। বিশাল শহর মুহূর্তে আমাদের তিনজনকে গিলে ফেলল। শব্দ, আলো, লোক, ব্যস্ততা, যানজট। এক সময় একটুখানির জন্যে উমা আমার হাত ধরেছিল। দু'চারটে উজ্জ্বল মুহূর্ত, কোমল মুহূর্ত, আবেগের মুহূর্ত জীবনে যদি আসে, যদি কুড়িয়ে পাওয়া যায় তাহলেই তো যথেষ্ট। হীরে কি লোকে অনেক চায়? একটা পেলেই তো যথেষ্ট। ময়দানের পাশ দিয়ে চলেছি। সেই বিশাল গাছ। তলায় ঘাস। অন্ধকারে তলিয়ে আছে। কোনোদিন সুযোগ পেলে, নির্জন দুপুরে উমাকে নিয়ে ছায়ায় বসব। আসনটা পেতে যাবো। জর্দাঅলা বলে আমার কি প্রেম থাকতে নেই। গরিবেরই তো প্রেম। বড়লোকের ভোগ।

দিন গেল। এল সেই মারাত্মক সময়। দাদাকে আমরা ফিরিয়ে নিয়ে

এলুম। গাড়ি থেকে নেমে দাদা আসছে। দাদার দুটো হাত দু'জনের কাঁধে। একপাশে উমা, একপাশে বউদি। নতুন আর এক অতিথি দাদার সঙ্গে আসছে। সেটা একটা ক্রাচ।

দাদা ঢুকেই ডাকছে, 'পিউ, পিউ কোথায় গেলি! আয় দেখে যা কেমন মজা! খোঁড়া ল্যাং ল্যাং ল্যাং।'

বুল ছুটে এল। অবাক হয়ে দেখছে। পায়ের বদলে পাজামা লতপত করছে।

দাদা বললে, 'দিদিকে ডাক। সে করছেটা কি? আমি এলুম।'

ভীম পহেলবানের চেলা বুল কেঁদে ফেললে, 'দিদি তো নেই বাবা। দিদি আর তুমি গেলে। তুমি এলে দিদি চলে গেল। ভগবান দিদিকে খুন করেছে।'

দাদা দু'হাতে বুলকে জড়িয়ে ধরতে গেল। আমরা ধরে ফেললুম। হাত ছেড়ে যে দাঁড়ানো যাবে না! এই শরীর যে এক সূক্ষ্ম গণিত। দাদা ধীরে ধীরে বসল। দু'হাতে জড়িয়ে ধরল বুলকে। দাদা যেখানে বসেছে তার পাশেই একটা বাহারী গাছের টব। পিউ সেই টবটায় রঙ দিয়ে সুন্দর আলপনা এঁকেছিল। একটা মুখোশ তৈরি করেছিল কাগজের মণ্ড দিয়ে। এই সব সে ভালই শিখেছিল। সামনের দেয়ালে ঝুলছে। দাদার মুখটাকেও মনে হচ্ছে প্রাণহীন এক মুখোশ। মুখোশের চোখে গড়াচ্ছে জল।

চালতাতলায় একটুকরো জমি আছে। আমি লক্ষ রাখি। আজ শরতের শেষ বৃষ্টিটা হয়ে গেছে। ভিজে নীল আকাশে মিঠে সূর্য। এত নীল যে বাতাসকেও মনে হচ্ছে নীলের গুঁড়ো মাখা। জমিটায় হয় কি, আপনাআপনিই অসংখ্য চারা লতা বেরোয়। কিছুকাল জীবনের মাতামাতি চলে, তারপর সব শুকিয়ে যায়। পোকা ধরে পাতা ঝরে। অসংখ্য পিঁপড়ে আসে। প্রজাপতি উড়তে এসে ফিরে যায়। পাখি এসে খুঁটে খুঁটে পোকা খায়। জমির টুকরোটা অপেক্ষা নিয়ে পড়ে থাকে। আবার বীজ আসে কোথা থাকে! প্রথম বর্ষার পরই ভরে যায় চারায়।

ঘটনাও সেইরকম। আমার জীবনের টুকরো ভরে গিয়েছিল। এখন আবার সেই ফাঁকা জমি। এখন শরীরে বেশ ব্যালেন্স এসেছে। আগে এক হাতে একটা ব্যাগ থাকত, এখন দু'হাতে দুটো ব্যাগ। অসংখ্য সুবাসিত জর্দার কৌটোর ঠুংঠাং শব্দ। প্রসাদ হাঁটছে। প্রসাদের দায়িত্ব বেড়েছে। এই বেশ

ভালো। জীবনের বাইরে থেকে জীবনকে দেখা। অন্যের স্বপ্নের চারায় জল ঢালা। অপেক্ষার মতো মধুর কিছু নেই। না পাওয়ার চেয়ে আনন্দের কি আছে। দুঃখের চেয়ে খাঁটি কিছু নেই। আর নেই-এর মতো চির-আছি হতে পারে না। জীবনের বাইরে দিয়ে ব্যাগ হাতে এই ভাবেই চলে যাবো। একজনের একটা কথার জাদুতে, 'ছেলেটা হেলে থাকে বটে কিন্তু মনটা নারকোল গাছের মত সোজা সরল।' তুমিও থাকো আমিও থাকি, তোমরাও থাকো। হাসি কাঁদি নাচি গাই। মেঘের মতো ছায়া ফেলে ফেলে অনুভূতিরা চলে যাক। ঋতুচক্রের আবর্তনের মতো অপেক্ষা ঘুরে যাক। এই যেমন বসে আছি শেষ শরতে শীতের অপেক্ষায়।

ASB —

সুন্দর / বাস্তব